সালফে সালেহিনের

অন্বেষণ

মূলঃ মুফতি ইজহারুল ইসলাম



ভুমিকা

আলহামদুলিল্লাহ!আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।ওয়াসসালাতু আসসালামু আলা রাসুলিহিন নাবিয়্যিল আমিন!ওয়াআলিহী ওয়াআসহাবিহী আজমাইন।আম্মাবা'দ!

বর্তমান সময়ের জেঁকে বসা ঈমানহানিকর আক্বিদা হল তথাকথিত বিভ্রান্তিকর 'সালাফি' আক্বিদা।'সালাফ' শব্দ দ্বারা পূর্বসূরী আইম্মায়ে কেরাম বুঝানো হলেও বর্তমানের সালাফিরা সাতশ বছর আগের হাফিয ইবনু তায়মিয়া,ইবনুল কাইয়্যিম জাওযিয়্যাহ,মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব নাজদি,শায়খ বিন বায,উসাইমিন এবং শায়খ আলবানিতেই সীমাবদ্ধ।সমগ্র বিশ্বের যুগবিদগ্ধ আলিমগণ একমত যে,বর্তমানের তথাকথিত এ আক্বিদা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জাম'আর বহির্ভূত।আর বাংলাদেশে এ আক্বিদা প্রচারের অন্যতম মূল হোতা হল 'আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন' বাংলাদেশ।

এ প্রতিষ্ঠানটি প্রতি বছর বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে।এর ধারাবাহিকতায় ২০২০ সালের আয়োজিতব্য প্রতিযোগিতা হলো আক্বিদা কেন্দ্রিক।সালাফি আক্বিদায় নিপুণ কলাকৌশলি এবং বাংলাদেশে নতুন পন্থায় সালাফিবাদের প্রচারকদের অগ্রপথিক হিসেবে 'আস-সুন্নাহ' ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম স্যার ড.খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (পিএইচডি,রিয়াদ) সাহেবের নাম প্রণিধানযোগ্য।উনার **'কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা**' নামক বইটি প্রতিযোগিতার মূল উপজীব্য হিসেবে নির্ধারিত হলে দেশের আলেমসমাজ প্রচুর লেখালেখির মাধ্যমে তার প্রতিবাদ জানান।
এরই ধারাবাহিকতায় **দেওবন্দি ঘরানার আলিম জনাব মুফতি ইজহারুল ইসলাম** সাহেবের কিছু **Public Post Of Facebook** কে একত্রিত করে কোনোরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন ছাড়াই 'সালফে সালেহীনের অন্বেষণ' নামের সংকলনে রূপ দেয় **The City Of Light Madinatul Munawara** এর টিম।

এ ভিন্ন ধর্মী সংগ্রাহী-পুস্তিকাটি প্রণয়ণের একমাত্র উদ্দেশ্য হল আহলে সুন্নত ওয়াল জাম'আর সঠিক আকীদাগুলো,বিশেষত আল্লাহ ﷻকেন্দ্রিক আকীদাগুলো সাধারণের পর্যায়ে পৌঁছে দেয়া।সংকলন জনিত ভুল ত্রুটির জন্য **The City Of Light** এর সাথে যোগাযোগের জন্য সবিনয় অনুরোধ থাকবে।আল্লাহ সহায় হোন।আমিন!

ফেসবুক লিংক:
The City Of Light :
https://www.facebook.com/The-City-of-Light-Madinatul-Munawara-625386564761555/
Ijharul Islam
https://www.facebook.com/hm.ijhar

সূচিপত্র

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

আক্কিদার বিতর্কের সমাধান নক্কলি বা দলিল নির্ভর হবে

যে কোন দু'টি দল বাস্তবেই যদি একে-অপরকে আহলে সুন্নত বহির্ভূত বা বিদয়াতী মনে করে, তাহলে এখানে বুঝতে হবে তাদের মাঝে দ্বীনের একেবারে মৌলিক বিষয়ে বিরোধ রয়েছে।

আবার উল্টোভাবে বললে দ্বীনের একেবারে মৌলিক বিষয়ে বিরোধ হলে একদল আরেকদলকে তা'বদী বা বিদয়াতী বলে থাকে। উভয় দলের কোন দল সঠিক, সেটা নির্ভর করছে প্রত্যেকের দলিলের উপর। একথা মোটামুটি সবারই জানা আছে যে, বর্তমানের তথাকথিত সালাফীরা আশয়ারী-মাতুরিদি আক্কিদা ও এর ইমামগণকে আক্কিদার বিষয়ে আহলে সুন্নত মনে করে না। সালেহ আল-মুনাজ্জিদ এর যে কোন ফতোয়া, সালেহ আল-ফাউজানের আক্কিদার কিতাব বা আলোচনা, যে কোন জায়গায় গেলেই বিষয়টি পাবেন।

সালাফীরা যেমন আশয়ারী-মাতুরিদেরকে বিদয়াতী মনে করে, একইভাবে আমরাও সালাফীদেরকে আক্কিদার ক্ষেত্রে বিদয়াতী মনে করি। এখানে কোন রাখঢাক নেই। কারণ, উভয় দলের মধ্যে মৌলিক আক্কিদা নিয়ে বিরোধ।

সালাফীরা অন্যদেরকে আহলে সুন্নতের খারিজ বললে অনেকে চুপ থাকে, কিন্তু সালাফীদেরকে আহলে সুন্নত থেকে খারিজ করলে অনেকে প্যানিকড হয়। এটা খুবই বাজে অভ্যাস। আপনি যে কোন মতেরই হতে পারেন, কিন্তু ইলমী আলোচনায় অন্তত: এতটুকু ধৈর্য্যের পরিচয় দিতে হবে যে, আপনি যেমন অন্যকে আহলে সুন্নত থেকে খারিজ করেন, তারাও আপনাকে খারিজ করতে পারে দলিলের কারণে।

আরেক শ্রেণি আছে, তারা উভয়ের মধ্যে সমন্বয় আশা করেন। আমি মনে করি, এখানে সমন্বয় সম্ভব নয়। আর সমন্বয়ের আশা করে তৃতীয় আরেকটি জগাখিচুড়ি মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনও নেই। এখানে পদ্ধতিগতভাবেই উসূলী ভিন্নতা। দুএকটা মাসআলার ভিন্নতা হলে হয়ত সমন্বয় করা যেত, কিন্তু মূল উসূল ও পদ্ধতিতে পার্থক্য হওয়াই সেটাও সম্ভব নয়।
এখন একটাই রাস্তা। উভয় দল তাদের দাবী ও দলিল উপস্থাপন করতে থাকবে। দলিল অনুযায়ী ফয়সালা হবে। আবেগ কিংবা বাহ্যিক ঐক্যের শ্লোগান এখানে অর্থহীন।

لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَة

আক্বিদা হলো মৌলিক বিষয়

কাররামিয়াদের ইতিহাস ও জীবনী পড়তে গিয়ে বেশ অবাক হয়েছি। এরা দেহবাদী ছিল। কিন্তু অবাক করার বিষয় হল, এদের অনেকেই আবেদ ও জাহেদ ছিল। দুনিয়া বিরাগী ছিল। ইবাদত - বন্দেগীতে আন্তরিক ছিল। এদের অনেক মুরীদ ও ভক্ত ছিল।

খারেজীদের ক্ষেত্রেও এধরণের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট। তাদের ইবাদতের সামনে অন্যদের ইবাদত তুচ্ছ মনে হবে। এরপরও কিন্তু তারা খারেজী ও জাহান্নামের কুকুর।

বিষয়টা নিয়ে ভাবা দরকার। আমরা একথা বলছি না, শরীয়তে ইবাদত-বন্দেগীর গুরুত্ব নেই। মায়াজাল্লাহ। বরং উদ্দেশ্য হল, বড় দায়ী, বড় আবেদ বা বড় বুজুর্গ হিসেবে প্রসিদ্ধ হলেও চিন্তা ও আক্বিদার সমস্যার কারণে বাতিল হতে পারে।

বিষয়টা অস্বাভাবিক মনে হলেও এটাই বাস্তবতা। কারও বাহ্যিক আমল, প্রসিদ্ধি বা জনপ্রিয়তা তার হক্ব হওয়ার দলিল নয়।

এজন্য ফেতনা থেকে মুক্ত থাকার জন্য ইলম চর্চার বিকল্প নেই। দ্বীনের যে কোন মেহনতে যদি ইলম চর্চাকে খাটো করা হয় বা অগুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়, সেটা এক সময় বড় ধরণের ফেতনা ও ভ্রান্তিতে পরিণত হয়। আহলে সুন্নতের সঠিক আক্বিদা-বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত দ্বীনি মেহনতই কেবল ফলপ্রসূ হবে। এর বাইরে বাহ্যিকভাবে যত মানুষকেই জড়ো করা হোক, যত অনুসারীই হোক, এর মধ্যে কোন কল্যাণ নেই।

আমাদের সমাজে দ্বীনি মেহনতকারী বিভিন্ন দল ও তাদের অনুসারীদের দ্বিতীয়বার ভাবা দরকার। আপনাদের কর্মপন্থা সঠিক আক্বিদা ও মানহাজের উপর নাকি শুধু দাওয়াত, ইবাদত ও বুজুর্গীর উপর। দ্বিতীয়টা হলে এখনই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। নতুবা ভক্ত ও মুরীদান সহ ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

সেদিন এক ভাই জিজ্ঞেস করেছিল, তাসাউফের বিভিন্ন সিলসিলায় ভন্ডামী ঢুকল কীভাবে?
আমি বললাম, শুরুর দিকে তাদের তাসাউফের ভিত্তি ছিল সঠিক ইলম ও সঠিক আক্বিদার উপর। রিয়াজাত, মুজাহাদা ও অন্যান্য বিষয়ের ভিত্তি ছিল আহলে সুন্নতের আক্বিদা। পরবর্তীতে ইলম ও আক্বিদা ছেড়ে শুধু আমল সর্বস্ব তাসাউফ চর্চা শুরু হয়। আক্বিদাকে গৌণ ভাবতে শুরু করে অনেকে। তখন থেকে এদের মধ্যে নানা ভ্রান্ত আক্বিদা - বিশ্বাস গড়ে ওঠে।

রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা পড়ুন। আগে আহলে সুন্নতের আক্বিদা দিয়ে শুরু। মুজাদ্দিদে আলফেসানীকে দেখুন। কী পরিমাণ আক্বিদার গুরুত্ব দিয়েছে। এজন্য শুধু তাসাউফ নয়, দাওয়াত, তাবলীগ, রাজনীতি, একাডেমিক গবেষণা সর্বত্রই আহলে সুন্নতের আক্বিদা বিশ্বাস হতে হবে মূলভীতি ও ফাউন্ডেশন। নতুবা এসব কিছু এক সময় বড় ধরণের ভ্রান্তি ও ফেতনার কারণ হবে। যদিও এসব দলে দলে লাখ লাখ মুরীদ ও ভক্ত জমা হোক। এজন্য আমাদের দ্বীনি সকল মেহনতের ভিত্তি হোক সঠিক আক্বিদা - বিশ্বাস। এটা শুধু মৌখিক দাবীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ না হোক যে, আমরা আহলে সুন্নতের অনুসারী। বরং সঠিকভাবে চর্চার মাধ্যমে এই দাবীর সত্যতাও নিশ্চিত হোক।

মরহুম ড.খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গির এর আক্বিদার উৎস কি?

মূল শিরোনাম :মরহুম আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যারের চিন্তাধারা ও আক্বিদার উৎস:

সম্প্রতি আস সুন্নাহ ফাউন্ডেশন থেকে ইসলামী আক্বিদার উপর একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। বই হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে মরহুম আব্দুল্লাহ জাহাংগীর সাহেবের কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আক্বিদা বইটি।

আমি ব্যক্তিগতভাবে মরহুম আব্দুল্লাহ জাহাংগীর সাহেবের আক্বিদাগত ত্রুটি নিয়ে তার জীবদ্দশায় বেশ কয়েকটি আর্টিকেল লিখেছিলাম। মুহাম্মাদ হুসাইন ভাইয়ের মধ্যস্ততায় ঢাকার দারুস সালাম এ দু'ঘন্টার বেশি সরাসরি আক্বিদা বিষয়ে আলাপ করেছি।

অনেকেই বিষয়টিকে নতুন মনে করছেন। বাস্তবে এই বিষয়গুলো বেশ পুরনো। আমি ইনশা আল্লাহ ধারাবাহিকভাবে তার আল-ফিকহুল আকবার ও ইসলামী আক্বিদা বইয়ের ভ্রান্তিগুলো নিয়ে আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ।

শুরুতেই মরহুমের আক্বিদা ও চিন্তাধারার উৎস সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। সৌদি আরবের কিং সৌদে পড়ার সুবাদে তিনি নজদী চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হোন। নজদীরা পূর্ববর্তী কাররামিয়া ও সালেমিয়্যাদের দেহবাদী আক্বিদাকে সালাফী আক্বিদা হিসেবে প্রচার করে থাকে। মরহুম মূলত: এই সালাফী আক্বিদার একজন আলিম ছিলেন। তিনি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহ্যাব নজদী ও তাইমি আক্বিদা-বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত হোন। নজদী-সালাফী আক্বিদার আদলেই তিনি তার আক্বিদা-বিশ্বাসগুলোকে ব্যাখ্যা করেছেন। নজদী - সালাফী আক্বিদার উপযোগী করে ইমাম আবু হানিফা রহ: এর আক্বিদা উপস্থাপন করতে গিয়ে তিনি তার বইয়ে বিভিন্ন জায়গায় নানা বিচ্যুতি ও ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। কারণ, নজদী-তাইমি আক্বিদা আর ইমাম আবু হানিফা রহ: এর আক্বিদা কখনও এক নয়। অথচ স্যার বা অন্যান্য সালাফীরা সব-সময় নিজেদেরক ইমাম আবু হানিফা রহ: এর অনুসারী ও সালাফের অনুসারী দাবী করে থাকে। বাস্তবতা হল, তাদের এই দাবীটি সম্পূর্ণ ভুল। তারা মূলত: কাররামিয়া ও সালেমিয়্যাদের দেহবাদী আক্বিদার আদলে সালাফের আক্বিদা উপস্থাপনের চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে এক দিকে যেমন সালাফের আক্বিদা বিকৃত করা হয়, আবার সালাফের অনুসরণের মিথ্যা দাবী প্রচার করা হয়। যার উভয়টিই নিন্দনীয়।

মরহুম আব্দুল্লাহ জাহাংগীর সাহেব তার ইসলামী আক্বিদা বইয়ের **চল্লিশ পৃষ্টায় ইসলামী আক্বিদা জানার** জন্য কিছু বইয়ের তালিকা দিয়েছেন। এই তালিকার শুরুতে তিনি লিখেছেন,

“আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, কুরআন কারীম এবং সহীহ হাদীসই ইসলামী বিশ্বাসের একমাত্র উৎস। ইসলামী বিশ্বাসের সকল মূল বিষয়ই কুরআন কারীমে উল্লেখ করা হয়েছে।এছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ এঁর হাদীসেও তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। *ইফতিরাক বা আকীদাগত বিভক্তি* ও দলাদলির কারণে মুসলিম উম্মাহর মূল ধারা বা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের ইমামগণ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ঈমানের বিশুদ্ধ মূলনীতি বা ইসলামী আকীদা ব্যাখ্যা করে পুস্তক লিখতে শুরু করেন। কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে এবং সাহাবীগণের মতামত ও ব্যাখ্যার আলোকে ইসলামী বিশ্বাসের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে মুসলিম উম্মাহর ইমামগণ প্রচুর বই-পুস্তক

রচনা করেছেন। নিম্নে প্রসিদ্ধ কিছু গ্রন্থের নাম উলে-খ করছি। লেখকের মৃত্যু তারিখের ভিত্তিতে ঐতিহাসিক ক্রম অনুসারে বইগুলি উলে-খ

করছি, যেন পাঠক এগুলির প্রাচীনত্ব ও মৌলিকত্বের পর্যায় বুঝতে পারেন।”

যে কোন ব্যক্তির চিন্তাধারা ও আক্বিদা পর্যালোচনার ক্ষেত্রে তার চিন্তাধারা উৎস সম্পর্কে ধারণা নেয়া জ্বরুরি। তিনি কাদের কাছ থেকে চিন্তাধারা নিয়েছেন এবং সেই চিন্তাধারার বাস্তবতা আসলে কী? এটা বুঝলে ব্যক্তির চিন্তাধারা বুঝতে সহজ হবে।

<u>আক্বিদার লিস্টের পর্যালোচনা:</u>

অবাক করার বিষয় হল, *তিনি ‘আস-সুন্নাহ’ শিরোনামে প্রায় ১৫ টি আক্বিদার কিতাব উল্লেখ করেছেন। সুন্নাহ শিরোনামের অধিকাংশ বইয়ের জায়গায় জায়গায় জঘন্য দেহবাদী কুফুরী-শিরকী আক্বিদা রয়েছে।* যার অনেক বিষয় আমাদের লিখতেও গা শিউরে ওঠে। আল্লাহ হেফাজত করুন। নমুনা হিসেবে একটি বইয়ের কিছু আক্বিদা এখানে উল্লেখ করছি। অন্যান্য অধিকাংশ বইয়ের অবস্থাও একই। মা'আযাল্লাহ।

আক্বিদার কিতাবের লিস্টে তিনি মাতুরিদি আক্বিদার কয়েকটি কিতাবের নামও উল্লেখ করেছেন। মাতুরিদি আক্বিদার সাথে সুন্নাহ শিরোনামের বিভিন্ন বাতিল আক্বিদার কিতাবের প্রচারও করেছেন। আক্বিদার লিস্টে তাফতাজানী বা অন্যান্য মাতুরিদি কিতাবের নাম উল্লেখ করলেও তিনি তাদের আক্বিদা গ্রহণ করেননি। বরং অন্যান্য জায়গায় তাদের আক্বিদাকে জাহমী মু’তাজেলী আক্বিদা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।(নাউজুবিল্লাহ)

আহলে সুন্নতের আক্বিদার লিস্টে শুরুতেই তিনি **আল-ফিকহুল আকবার** এর কথা উল্লেখ করেছেন। অনেকেই হয়ত ভাববেন, তিনি বোধ হয় ইমাম আবু হানিফা রহ: এর আক্বিদা অনুসরণ করেছেন।কিন্তু বাস্তবতা এর ঠিক উল্টো।*তিনি মূলত: নজদী-সালাফীদের আক্বিদার আদলে ব্যাখ্যার নামে ইমাম আবু হানিফা রহ: এর আক্বিদাকে সালাফী আক্বিদার উপযোগী করে উপস্থাপন করেছেন এবং ব্যাখ্যার নামে নজদীকরণ করেছেন।*

দ্বিতীয় নাম্বারে যে কিতাব উল্লেখ করেছেন সেটি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ: এর নামে প্রচারিত কিতাবুস সুন্নাহ। এই কিতাবকে নজদী-সালাফীরা তাদের মৌলিক আক্বিদার কিতাব মনে করে। অথচ এ কিতাবের জায়গায় জায়গায় দেহবাদী কুফুরী - শিরকী আক্বিদা রয়েছে।

এসব কুফুরী -শিরকীতে ভরা দেহবাদী আক্বিদার কিতাবকে ইসলামী আক্বিদার বিশুদ্ধ গ্রন্থ হিসেবে উল্লেখ করা এবং সেটা প্রচার করা মারাত্মক পর্যায়ের ভ্রান্তি। এসব কিতাবের কী পরিমাণ ভ্রান্ত আক্বিদা রয়েছে, তার কিছু নমুনা নীচে উল্লেখ করছি।

৭ লাখ টাকা পুরষ্কারের আশায় যারা এসব দেহবাদী আক্বিদার কিতাবকে বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বিদার উৎস গ্রন্থ মনে করবে, তারা কত বড় ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হবে ভেবে দেখুন। আল্লাহ তায়ালা প্রতিযোগিতার নামে দেহবাদী কুফুরী-শিরকী আক্বিদা প্রচার ও তার সহযোগিতা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন।

আশ্চর্যের বিষয় হল,সুন্নাহ শিরোনামের যেসব আক্বিদার কিতাবের নাম মরহুম উল্লেখ করেছেন, এগুলোর অধিকাংশ তথাকথিত সালাফীরা তাদের মৌলিক আক্বিদার কিতাব মনে করে। আর এসব আক্বিদার অধিকাংশ কিতাবই দেহবাদী কুফুরী-শিরকী আক্বিদায় ভরা। দেহবাদী কুফুরী-শিরকী আক্বিদায় ভরা এজাতীয় কিতাবকে ইসলামী আক্বিদার বিশুদ্ধ উৎস হিসেবে উল্লেখ করা কখনও সমর্থনযোগ্য নয়।

সালাফীদের নিকট ‘সুন্নাহ’ শিরোনামের কিতাবের গুরুত্ব
শায়খ বিন বায বলেন,

ومن أراد الوقوف على كثير من ذلك فليراجع ما كتبه علماء السنة في هذا الباب مثل **كتاب (السنة) لعبد الله بن الإمام أحمد** ، و(التوحيد) للإمام الجليل محمد ابن خزيمة ، وكتاب (السنة) لأبي القاسم اللالكائي الطبري ، وكتاب (السنة) لأبي بكر بن أبي عاصم

অর্থ: ‘‘আক্বিদা বিষয়ে যারা আরও বিস্তারিত জানতে চায় তারা যেন আহলুস সুন্নাহ এর আলেমগণ এ বিষয়ে যা লিখেছেন সেগুলো অধ্যয়ন করে। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদের আস-সুন্নাহ, ইবনে খোজাইমার আত-তাউহীদ, ইবনে আবি আসিম এর আস-সুন্নাহ।.....[১]

শায়খ সালেহ আল-ফাউজান বলেন,

الحمد لله نحن أغنياء بما خلَّفه لنا سلفنا الصالح من كتب العقائد، وكتب الدعوة، وليست بأسلوب جاف –كما زعم هذا الكاتب -، بل بأسلوب علمي من كتاب الله وسنة رسوله ، أمثال :صحيح البخاري، ومسلم، وبقية كتب الحديث، ومن كتاب الله ﷺ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ثم كتب السنة، مثل :كتاب ‘‘السنة ‘‘لابن أبي عاصم، و ‘‘الشريعة ‘‘للآجري، و ‘‘السنة ‘‘لعبدالله بن الإمام أحمد، وكتب شيخ الإسلام ابن تيميَّة وتلميذه ابن القيم، وكتب شيخ الإسلام المجدد: محمد بن عبدالوهاب. فعليكم بهذه الكتب والأخذ منها .

অর্থ: আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সালাফে সালেহীন আমাদের জন্য যেসব আক্বিদা ও দাওয়াতের কিতাব রেখে গেছেন সেগুলোই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এগুলোর রচনা শৈলি অন্ত:সার শূন্য নয়, যেমনটি এই লেখক (মুহামআমদ বিন সুরুর) ধারণা করেছে। বরং আল্লাহর কিতাব ও রাসূল ﷺ এর সুন্নাহ অনুযায়ী তার ইলমী আঙ্গিকে রচনা করেছেন।যেমন বোখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসের কিতাব এবং আল্লাহর কুরআন, যার সম্মুখ ও পশ্চাতে কোন বিভ্রান্তিমূলক বিষয় নেই। এছাড়াও আমাদের আক্বিদার কিতাব রয়েছে, যেমন ***ইবনে আবি আসেমের ‘আস-সুন্নাহ’, আজুররীর ‘আশ-শরিয়া’, আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদের***

‘আস-সুন্নাহ’, শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ও তার ছাত্র ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এর কিতাবসমূহ, এবং শায়খ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওহাব নজদীর কিতাবসমূহ। আপনাদের জন্য এগুলো অধ্যয়ন ও তা থেকে জ্ঞান আহরণ জরুরি।[২]

সালাফীদের প্রধান মৌলিক কিতাব হলো ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর ছেলের (?) কিতাব ‘আস-সুন্নাহ’। তারা সর্বদা এই কিতাব পড়ার প্রতি উৎসাহিত করে এবং এ থেকে তাদের আকিদার প্রমাণ দিয়ে থাকে। এই কিতাবকে তারা কতটা গুরুত্ব দেয়, তা তাদের কর্মপন্থা থেকে সহজে অনুমেয়। ***প্রথমে কিতাবটি আব্দুল্লাহ বিন হাসান বিন হুসাইন আলুশ-শায়খ এর তত্ত্বাবধানে‘আস-সুন্নাহ’ কিতাবটি লাজনাতুম মিনাল মাশাইখ ওয়াল এর পক্ষ থেকে তাহকীক সহ প্রকাশ করা হয়।*** পরবর্তীতে তাহকীক করে প্রকাশ করেছে ***ড.মুহাম্মাদ বিন সাইদ আল-কাহতানী উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটি*** থেকে এর উপর ডক্টরেট ডিগ্রি নিয়েছেন। তার এই থিসিস প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ সালে।

ড.মুহাম্মাদ বিন সাইদ আল-কাহতানী আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদের এই কিতাব সম্পর্কে লিখেছেন,

إن هذا الكتاب من أوائل المصادر التي كتبت في عقيدة السلف فإخراجه للناس في هذا العصر من الأهمية بمكان

—**“**সালাফী আকিদার উপর লিখিত কিতাবসমূহের মাঝে এটি প্রথম শ্রেণির কিতাব। বর্তমান সময়ের মানুষের জন্য এটা প্রকাশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।**”**[৩]

তিনি আরও লিখেছেন,

هذا الكتاب من أمهات مصادر العقيدة في كتب السلف ؛لذا فهو من المصادر الأولى إذ لم يتقدمه إلا بعض الكتب الصغيرة..فهو من هذا الجانب ذا مكانة كبيرة حيث اعتمدت عليه كثير من الكتب التي صنفت في عقيدة السلف فهو بحق مصدر رائد برزت قيمته في من نقل عنه وعزا إليه فهذا الكتاب صنو لهذه المصنفات التي هي اليوم تحتل **مكان الصدارة بعد كتاب الله** في المكتبة الإسلامية

—**“**সালাফী আকিদার জানার মৌলিক উৎসগুলোর একটি হলো এই কিতাব।...এটি আকিদা বিষয়ক প্রথম মৌলিক কিতাব বলা যায়। কিছু ছোট ছোট কিতাব ব্যতীত এর পূর্বে আর কোন কিতাব লেখা হয়নি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে কিতাবটি খুবই মূল্যবান। কেননা সালাফী আকিদার উপর লিখিত অনেক কিতাব এই কিতাবের উপর নির্ভর করে লেখা হয়েছে। ***প্রকৃতপক্ষে এই কিতাবটি হলো এই কিতাবটি সালাফী আকিদার প্রাথমিক উৎস, যারা এই কিতাব থেকে বর্ণনা করেছে এবং এখান থেকে আকিদা গ্রহণ করেছে, তাদের কাছে এটিই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান ইসলামী লাইব্রেরীগুলোতে যেসব কিতাব পবিত্র কুরআনের পরবর্তী স্থান দখল করেছে সেসব কিতাবের সমপর্যায়ের।”***[৪]

‘আস-সুন্নাহ’ এর ভ্রান্ত আকিদাসমূহ:

পূর্ববর্তী আকিদার নামে যেসব কিতাব প্রচার করা হয় তার অধিকাংশ পাঠের অযোগ্য কিতাব। **এতে এতো বেশি পরিমাণ জাল ও জয়ীফ বর্ণনা রয়েছে যে, এগুলোকে আকিদার কিতাব না বলে জয়ীফ হাদীসের সংকলন বলা যায়।** আস-সুন্নাহ, আত-তাউহীদ, আল-উলু ইত্যাদি নামে যেসব কিতাব লেখা হয়েছে এগুলোর অধিকাংশ একই রকম। **'জাল ও জয়ীফ হাদীসের কবলে সালাফী আকিদা'** শিরোনামে ইনশাআল্লাহ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো। আশ্চর্যের বিষয় হলো, ফজীলতের ক্ষেত্রে ইমাম গাযালী রহ. কিছু জাল হাদীস উল্লেখ করার কারণে সালাফীরা তার ব্যাপক সমালোচনা করে থাকে। অথচ তাদের অধিকাংশ আকিদার কিতাবে জাল ও জয়ীফ বর্ণনার ছড়াছড়ি থাকলেও এ বিষয়ে সাধারণ তারা মুখ খোলে না। এই দ্বিমুখী নীতি সত্যিই বিস্ময়কর।

ড.কাহতানীর তাহকীক অনুযায়ী আস-সুন্নাহ কিতাবের শতকরা ৫৮ টি হাদীস ও আছার দুর্বল।অনেক বর্ণনা জাল।তাহলে এবার চিন্তা করুন, এই কিতাবে আকিদার নামে আসলে কী শিখানো হয়েছে। এবার দেখুন সালাফীদের প্রধান আকিদার কিতাবে কী পরিমাণ ভ্রান্ত আকিদা শিখানো হয়েছে,

➤আল্লাহ তায়ালা আরশে বসে আছেন

এ বিষয়ে কিতাবুস সুন্নাহ তে পৃথক একটি পরিচ্ছেদ তৈরি করা হয়েছে। পরিচ্ছেদের নাম হলো,

سُئِلَ عَمَّا رُوِيَ فِي الْكُرْسِيِّ وَجُلُوسِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْه

আমার পিতাকে কুরসী ও আল্লাহ তায়ালার বসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়।

এই অধ্যায়ের শুরুতে লেখা আছে,আমার পিতাকে দেখেছি, এসব হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং এগুলোকে সহীহ বলেছেন।**অথচ এ অধ্যায়ের অধিকাংশ হাদীস দুর্বল বা মুনকার।**

وروى عبد الله بن أحمد بإسناده عن النبي وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ إِنَّهُ لَيَقْعُدُ عَلَيْهِ جَلَّ وَعَزَّ فَمَا يَفْضُلُ مِنْهُ إِلَّا قِيدُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ وَإِنَّ لَهُ أَطِيطًا كَأَطِيطِ الرَّحْلِ إِذَا رُكِب

আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ নিজ সনদে নবী কারীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছে, তার কুরসী আসমান-জমিনকে বেষ্টন করে আছে। **নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা কুরসীর উপর বসেন এবং আল্লাহর বসার পর কুরসীর চার আঙ্গুল পরিমাণ অবশিষ্ট থাকে। তিনি যখন আরোহণ করেন তখন বাহনে আরোহণের মতো শব্দ হয়।**[৬]

হাদীসটি রাসূল ﷺ থেকে প্রমাণিত নয়।এটি ইসরাইলী রেওয়াত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক।অথচ এজাতীয় মুনকার হাদীস দ্বারা মারাত্মক কিছু কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এই মুনকার হাদীসে সেসব ভ্রান্ত আকিদা রয়েছে,

১.আল্লাহ তায়ালা কুরসীর উপর বসেন।

২. কুরসী আল্লাহ তায়ালা থেকে বড়। একারণে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁকা থাকে।

৩. বাহনে আরোহণ করলে যেমন শব্দ হয়, তেমনি কুরসীর উপর আরোহণ করলে শব্দ হয়।

একটি পাথরে আল্লাহর হেলান দেয়া:

كتب الله التوراة لموسى عليه السلام بيده وهو مسند ظهره إلى الصخرة في ألواح در فسمع صريف القلم ليس بينه وبينه إلا الحجاب!

অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ নিজ সনদে আবু আত্তাফ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা একটি পাথরে তার পিঠ হেলান দিয়ে নিজ হাতে মুসা আ. এর জন্য মতির ফলকে তাওরাত লিখেছেন। হযরত মুসা আ. কলমের লেখার শব্দ পর্যন্ত শুনেছেন। আল্লাহ তায়ালা এবং মুসা আ. এর মাঝে একটি পর্দা ছাড়া আর কিছুই ছিলো না।[৭]

নাউযুবিল্লাহ। আমরা এধরনের নিকৃষ্ট কথা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। আল্লাহ তায়ালার সাথে এধরনে জঘন্য বেয়াদবি থেকে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন।

আল্লাহর স্বর্ণের কুরসী ও চার আকৃতির চারজন ফেরেশতা তা বহন:

وروى ابن أحمد أيضاً بإسناده أثراً عن ابن عباس: أن النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) رأى ربه على كرسي من ذهب تحمله أربعة من الملائكة ملك في صورة رجل وملك في صورة أسد وملك في صورة ثور وملك في صورة نسر في روضة خضراء دونه فراش من ذهب

অর্থাৎ রাসূল ﷺ আল্লাহ তায়ালাকে একটি স্বর্ণের কুরসীর উপর বসা দেখেছেন। এই কুরসীটি চারজন ফেরেশতা বহন করছে। একজন ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতে, আরেকজন ফেরেশতা সিংহের আকৃতিতে, অপরজন গরুর আকৃতিতে এবং আরেকজন বাজপাখির আকৃতিতে। আল্লাহ তায়ালা একটি সবুজ উদ্যানে ছিলেন এবং তার নিচে স্বর্ণের বিছানা ছিলো।[৮]

আল্লাহর দুই বাহু ও বুকের নূর থেকে ফেরেশতা সৃষ্টি:

خلق الله الملائكة من نور الذراعين والصدر

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে তার দুই বাহু ও বুকের নূর থেকে সৃষ্টি করেন।[৯]

১.

وروى عبد الله بن أحمد أن الله يقول لداود عليه السلام يوم القيامة: (إدنه إدنه حتى يضع بعضه عليه) وفي لفظ (حتى يأخذ بقدمه)

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন হযরত দাউদ عليه السلام. কে বলবেন, নিকটবর্তী হও, নিকটবর্তী। এমনকি হযরত দাউদ عليه السلام তাঁর ﷺ দেহের কিছু অংশ আল্লাহর কিছু অংশের উপর রাখবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এমনকি হযরত দাউদ عليه السلام. আল্লাহর পা ধরবেন।[১০]

এর দ্বারা বোঝা গলে, হযরত দাউদ এর عليه السلام দেহের কিছু অংশ আল্লাহরে কিছু অংশরে উপর রাখবেন। কতো ভয়ংকর আকিদা? অথচ আল্লাহ তায়ালার জন্য অংশ আছে বলে বিশ্বাস করা স্পষ্ট কুফুরী।

২.

أن الله وضع يديه بين كتفي النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) حتى وجد بردها على قلبه

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তার দুই হাত নবীজী স. এর দুই কাঁধের মাঝে রাখেন। এমনকি রাসূল স. তার অন্তরে আল্লাহর হাতের শিতলতা অনুভব করেন। [১২]

৩.

أن جلد الكافر يوم القيامة أربعون ذراعاً بذراع الجبار

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কাফেরের চামড়া চল্লিশ গজ মোটা হবে আল্লাহর গজ অনুযায়ী।[১৩]

৪.

وأن السماء ممتلئ بالله عز وجل. المصدر السابق

(২/৪৫৭).

অর্থাৎ আসমান আল্লাহ তায়ালা দ্বারা পরিপূর্ণ।[১৪]

৫.

وأن أسباب الزلازل أن الله يبدي بعضه للأرض فتتزلزل

অর্থাৎ ভূমিকম্প হওয়ার কারণ হলো, আল্লাহ তায়ালা তার দেহের কিছু অংশ জমিনে প্রকাশ করে,ফলে যমিন কেঁপে ওঠে।[১৫]

৬.

وأنه ينـزل كل عشية ما بين المغرب والعصر ينظر لأعمال بني آدم

অর্থাৎ আল্লাহ ﷺ প্রত্যেক সন্ধ্যায় আসর থেকে মাগরিবের মাঝামাঝি সময়ে নেমে আসেন আদম সন্তানের আমল দেখার জন্য।[১৬]

৮.

وأن عرش الرحمن مطوق بحية

অর্থাৎ আল্লাহর আরশ একটি সাপ দ্বারা পেঁচানো রয়েছে।[১৮]

৯.

(২/৪৭৫) وأن الكرسي كالنعل في قدميه. المصدر السابق

অর্থাৎ কুরসী হলো আল্লাহর দু’পায়ের জুতার মতো।[১৯]

১০.

وأن الله يطوف في الأرض

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা জমিনে তওয়াফ বা চক্কর দেন।[২০]

১১.

وأن الله يضع يده في يد داود

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তার হাত হযরত দাউদ আ. এর হাতে রাখবেন।[২১]

১২

ويأمره أن يأخذ بحقوه

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা হযরত দাউদ আ. কে তার কোমর ধরার আদেশ দিবেন।[২২]

১৩.

وأن هذه الرياح من نفس الرحمن. المصدر السابق

(২/৫১০)

অর্থাৎ পৃথিবীর বাতাস হলো আল্লাহর শ্বাসের অংশ।[২৩]

১৪.

وأنه لا تبقى خيمة من خيام الجنة إلا دخلها ضوء وجهه ويستبشرون بريحه. المصدر السابق
(২/৫২৪).

অর্থাৎ জান্নাতের এমন একটা তাবু অবশিষ্ট থাকবে না যেখানে আল্লাহর চেহারার নূর পৌছবে না এবং তারা আল্লাহর ঘ্রাণ দ্বারা আনন্দ লাভ করবে।[২৪]

১৫.

وأنه لما تجلى للجبل، بسط كفه ووضع إبهامه على خنصره.

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যখন পাহাড়ের উপর তাজাল্লী বর্ষণ করেন, তার হাতের তালু বিস্তৃত করেন এবং তার বৃদ্ধাঙ্গুল কনিষ্ঠ আঙ্গুলের উপর রাখেন।[২৫]

উদ্ধৃতিসমূহ:

[১] মাজমুউ ফাতাওয়া ও মাকালাত, ইবনে বায, খ.১, পৃ.১৮।

[২] আল-আজইবাতুল মুফিদা আনিল আস-ইলাতিল মানাহিজিল জাদিদা। পৃ.৮১।

[৩] আস-সুন্নাহ এর ভূমিকা। খ.১, পৃ.১৫। তাহকীক, মুহাম্মাদ বিন সাইদ কাহতানী।

[৪] আস-সুন্নাহ এর ভূমিকা। খ.১, পৃ.৬৫-৬৬। তাহকীক, মুহাম্মাদ বিন সাইদ কাহতানী।

[৫] আস-সুন্নাহ, খ.১, পৃ.১০২। কাহতানী এর তাহকীক।

[৬] কিতাবুস সুন্নাহ খ.১, পৃ.৩০৫।

[৭] কিতাবুস সুন্নাহ, খ.১,পৃ.২৯৪, খ.২, পৃ.৪৬১।

[৮] আস-সুন্নাহ, খ.১, পৃ.১৭৬

[৯] আস-সুন্নাহ, খ.২, পৃ.৪৭৫, খ.২, পৃ.৫১০।

[১০] আস-সুন্নাহ, খ.২, পৃ.৪৭৫

([১১]) المصدر السابق الآثار (৪৯০).

[১২] আস-সুন্নাহ, বর্ণনা নং ৮৯০

[১৩] আস-সুন্নাহ, খ.২, পৃ.৪৯২।

[১৪] আস-সুন্নাহ, খ.২, পৃ.৪৫৭।

[১৫] আস-সুন্নাহ, খ.২, পৃ.৪৭০।

[১৬] আস-সুন্নাহ, খ.২, পৃ.৪৭০।

[১৭] আস-সুন্নাহ, খ.২, পৃ.৮৭২।

[১৮] আস-সুন্নাহ, খ.২, পৃ.৪৭৪।

[১৯] আস-সুন্নাহ, খ.২, পৃ.৪৭৫।

[২০] আস-সুন্নাহ, খ.২, পৃ.৪৮৬।

[২১] আস-সুন্নাহ, খ.২, পৃ.৫০২।

[২২] আস-সুন্নাহ, খ.২, পৃ.৫০৩।

[২৩] আস-সুন্নাহ, খ.২, পৃ.৫১০।

[২৪] আস-সুন্নাহ, খ.২, পৃ.৫২৪।

[২৫] আস-সুন্নাহ, খ.২, পৃ.৫২৫।

আইম্মায়ে মাযহাবের ব্যাপারে ড. সাহেবের বিকৃত উপস্থাপনা:পর্ব ১

মূল শিরোনাম :চার ইমামের নামে মরহুম আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গির সাহেবের ভ্রান্ত আক্বিদা প্রচার (১ম পর্ব)

মরহুম ডক্টর খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গির সাহেব তার ***'কুরআন- সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আক্বিদা'*** বইয়ের একেবারে শুরুর দিকে তার আক্বিদা বিষয়ক অবস্থান তুলে ধরেছেন। তিনি বার বার লিখেছেন, তিনি মূলত: ইসলামের প্রথম তিন যুগ বিশেষ করে চার ইমামের আক্বিদা অনুসরণ করতে চান। চলুন তার কাছ থেকেই বিষয়টি শোনা যাক,

"উম্মাতের মধ্যে আকীদার ক্ষেত্রে অনেক বিতর্ক ও মতভেদ রয়েছে। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, যে ব্যক্তি কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীসগুলি মনোযোগের সাথে পাঠ করবেন এবং প্রথম তিন শতাব্দীর আলিমদের লেখা বইপত্র, বিশেষত প্রসিদ্ধ চার ইমামের লেখা পুস্তকাদি পড়ে আকীদা শিখবেন, তার আকীদা এবং যে ব্যক্তি পরবর্তী যুগের, বিশেষত ক্রুসেড ও তাতার আক্রমনে মুসলিম বিশ্ব ছিন্নভিন্ন হওয়ার পরে- হিজরী ৭ম শতকের পরের- আলিমদের লেখালেখি পড়ে আকীদা শিখবেন, তার আকীদার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য দেখা যায়। আবার এক্ষেত্রে ৭ম শতকের আকীদার সাথে ১৩শ শতকের আকীদার অনেক পার্থক্য, বিবর্তন ও পরিবর্তন লক্ষণীয়। সকলেই কুরআন ও হাদীসের 'দলীল' প্রদান করেন। তবে প্রথম ব্যক্তি কুরআন, হাদীস ও প্রথম

যুগের আলিমদের কথাকেই মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন এবং এগুলির অতিরিক্ত কথা বা মতামত অগ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেন।
পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ব্যক্তি মূলত পরবর্তী যুগের আলিমদের মতামতকেই ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন এবং তার ভিত্তিতে কুরআন ও হাদীসের কথা গ্রহণ, বর্জন বা ব্যাখ্যা করেন।পুরাতন ও নতুনের এ মতভেদে পুরাতনের প্রতি আমার আকর্ষণ ও দুর্বলতা কখনোই গোপন করি না। মানবতার মুক্তির নূর বিচ্ছুরিত হয়েছে মহান আল্লাহর মহান রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ থেকে। তাঁর এ নূরে পরিপূর্ণ আলোকিত হয়েছেন সাহাবীগণ।পরবর্তী দু'শতাব্দীর মানুষেরা তাঁদের নূর ভালভাবে পেয়েছিলেন।সত্য ও মুক্তি তো পুরাতন সে যুগের পুরাতন মানুষদেরকে ঘিরেই আবর্তিত হয়।মতভেদীয় বিষয়ে সকল পক্ষের মতই পরিপূর্ণ ভালবাসা ও আন্তরিকতার সাথে পড়তে চেষ্টা করেছি।তবে যারা মূলতই পরবর্তী যুগের আলিমদের ব্যাখ্যা,তাফসীর বা মতামতের উপর নির্ভর করেছেন,কিন্তু কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য বা সাহাবী-তাবিয়ীগণের কোনো সুস্পষ্ট মতামত পেশ করেন নি তাঁদের মতামত গ্রহণ করতে পারি নি, তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ থাকা সত্ত্বেও।
আমাদের বিশ্বাস যে, আকীদার বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর হুবহু অনুসরণ এবং সাহাবী, তাবিয়ী, তাবি-তাবিয়ী ও প্রসিদ্ধ চার ইমামের মতামতের বাইরে না যাওয়াই মুমিনের নাজাত ও প্রশান্তির পথ। প্রথম তিন মুবারক যুগে বা প্রসিদ্ধ চার ইমামের যুগে যে সকল হাদীস প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, প্রসিদ্ধ হাদীসের গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে এবং প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ সহীহ বলে গ্রহণ করেছেন সেগুলির উপরেই নির্ভর করতে হবে। পরবর্তী যুগে সংকলিত অপ্রসিদ্ধ, গরীব, যয়ীফ ইত্যাদি হাদীসের উপর নির্ভরতা বর্জন করতে হবে। এগুলিকে ফযীলতের বিষয়ে কেউ বর্ণনা করলেও কোনো অবস্থাতেই এগুলি আকীদার উৎস নয়।কুরআনের তাফসীর, হাদীসের ব্যাখ্যা ও আকীদা বিষয়ক অন্যান্য মতামতের ক্ষেত্রেও একই কথা। সহীহ সনদে তাঁদের থেকে এ সকল বিষয়ে যা বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে এবং এ সকল বিষয়ে তাঁরা যা বলেন নি তা বর্জন করতে হবে।

এজন্য এ বইয়ের মূল ভিত্তি কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীস। কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যার জন্য সাহাবী, তাবিয়ী ও ঈমামগণের মতামতের উপরে নির্ভর করেছি।আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা ব্যাখ্যার জন্য মূলত সাহাবীগণ এবং তাঁদের পরে তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ী যুগের আলিমগণের প্রমাণিত বিশুদ্ধ মতামত এবং চার ইমামের লিখিত পুস্তকাদির উপর নির্ভর করেছি।”

একটু বড়সড় উদ্ধৃতিই উল্লেখ করেছি। এটি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আক্বিদা বইয়ের ভূমিকায় রয়েছে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের আক্বিদা বিশ্বাসে বিবর্তনের যেই চিত্র তিনি এখানে একেছেন, সেটি পুরোপুরি সত্য নয়। সেই আলোচনায় আমরা এখন যাচ্ছি না। এই উদ্ধৃতি থেকে স্যারের গুরুত্বপূর্ণ দু'টি দাবী তুলে ধরা উদ্দেশ্য।

১। তিনি ইসলামের প্রথম তিন যুগের আলিমগণকে অনুসরণের চেষ্টা করেছেন বিশেষত চার ইমামের আক্বিদা-বিশ্বাসকে সামনে রেখেছেন।

২। তাদের আক্বিদা বিশ্বাস গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি শুধু সহীহ বিষয়গুলো গ্রহণ করেছেন।

আজকের আলোচনায় আমরা দেখব স্যার উভয় দাবীর একটিও কি রক্ষা করতে পেরেছেন কি না। নাকি এগুলো নিছক মুখের দাবী, বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন?

ইমাম শাফেয়ী রহ. এর আকিদার নামে জাল বর্ণনা প্রচার:

এবার মূল প্রসঙ্গে আসা যাক। ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব ইমাম আবু হানিফা রহ. এর আকিদা ব্যাখ্যার নামে **আল-ফিকহুল আকবার** নামে যে কিতাব লিখেছেন, এটি আসলে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর আকিদার ব্যাখ্যা নয়। মূলত: ইমাম আবু হানিফার নামের আড়ালে সালাফীদের বাতিল আকিদা প্রচারই এই কিতাবের মূখ্য বিষয়। এই কিতাবের প্রত্যেকটি আলোচনা তাই প্রমাণ করে। ড. জাহাঙ্গীর সাহেব সালাফীদের ভ্রান্ত আকিদা প্রচার করতে গিয়ে ইমামদের নামে বিভিন্ন জাল ও দুর্বল বর্ণনাও এই কিতাবে এনেছেন। আজকের আলোচনায় ইমাম শাফেয়ী রহ. এর নামে সালাফীদের বহুল প্রচারিত একটি জাল বর্ননা সম্পর্কে আলোচনা করবো।

বাংলাদেশে সালাফী মতবাদের অন্যতম প্রচারক ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব তার আল ফিকহুল আকবারের ২৭০ পৃষ্ঠায় ইমাম শাফেয়ী রহ. এর উক্তিটি এনেছেন।(এখানে স্ক্রিনশট ছিল)

বর্ণনাটির সনদ বিশ্লেষণ:

ঘটনাটি **ইমাম যাহাবী** তার **আল-উলু** কিতাবে এবং ***ইবনুল কাইয়্যিম তার " ইজতেমাউল জুয়ুশিল ইসলামিয়া"*** কিতাবে উল্লেখ করেছেন। বর্ণনার সনদ:

روى شيخ الإسلام أبو الحسن الهكاري ، والحافظ أبو محمد المقدسي بإسنادهم إلى أبي ثور وأبي شعيب كلاهما عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي ناصر الحديث رحمه الله قال: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهما الاقرار بالشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، **وأن الله تعالى على عرشه في سمائه** يقرب من خلقه كيف شاء وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء .

অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন: আমি যে তরিকার উপর প্রতিষ্ঠিত ও যাদেরকে ঐ তরিকার উপর পেয়েছি যেমন সুফিয়ান সাওরী, মালিক প্রমখগণ তা হল- এ কথার স্বীকৃতি দেয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন হক মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল **আর আল্লাহ তিনি আসমানে আরশের উপর রয়েছেন।**তিনি তার বান্দার নিকটবর্তী হন যে ভাবে ইচ্ছা করেন এবং যে ভাবে চান ঠিক সেভাবেই দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন।

এই সনদের প্রথম বর্ণনাকারী হলেন,

১. আলী ইবনে আহমাদ ইবনে ইউসুফ আল-হাক্কারী

তিনি ছিলেন একজন মিথ্যুক ও জালকারী।

তার সম্পর্কে ইমামগণের বক্তব্য:

ইমাম যাহাবী তার বিখ্যাত কিতাব **মিযানুল ই'তেদালে লিখেছেন, খ.৩, পৃ.১১২** ইমাম ইবনুন নাজ্জার বলেছেন, সে হাদীস জাল করার অভিযোগে অভিযুক্ত এবঙ সে সনদ বানানোর ব্যাপারেও অভিযুক্ত ।

আরবী পাঠ:

وقال ابن النجار : متهم بوضع الحديث وتركيب الأسانيد

ইমাম আবুল কাসেম ইবনে আসাকির বলেছেন, সে হাদীসের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত নয়।

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রহ. লিসানুল মিযান এ বলেছেন,সে গরীব ও মুনকার বর্ণনা উল্লেখ করে থাকে। তার হাদীসে জাল বর্ণনা রয়েছে। আমি মুহাদ্দিসগণের লেখায় দেখেছি, সে ইস্পাহানে হাদীস জাল করতো।

আরবী পাঠ:

وكان الغالب على حديثه الغرائب والمنكرات ، وفي حديثه أشياء موضوعة ورأيت بخط بعض أصحاب الحديث أنه كان يضع الحديث بأصبهان

➤**২. এই বক্তব্যের আরেকজন বর্ণনাকারী হলো, আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদিসী, তিনি মুজাসসিমা** হওয়ার কারণে উলামায়ে কেরাম তাকে হত্যা করা বৈধ হওয়ার ফতোয়া দিয়ছিলেন । দেখুন, **আবু শামা মাকদেসী** এর লেখা **আয-যায়িল আলার রাওযাতাইন, পৃ.৪২ ও ৪৭।**

এই বর্ণনাটি ইমাম শাফেয়ী থেকে বর্ণনা করেছে আবু শুয়াইব। তিনি ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মৃত্যুর দু'বছর পরে জন্মগ্রহণ করেন। দেখুন, তারীখে বাগদাদ,৯, পৃ.৪৩৬

এই বর্ণনাটি যে **ইমাম শাফেয়ী এর নামে জালিয়াতি** ও বানানো ইমাম যাহাবী নিজে তা উল্লেখ করেছেন। দেখুন, **মিযানুল ই'তেদাল, খ.৩, পৃ.৩৭৬।**

এছাড়া বক্তব্যটি ইমাম শাফেয়ী রহ: এর নামে জাল হওয়ার বিষয়টি **সালেহ আল-মুনাজ্জিদসহ** আরও কিছু আলিম স্বীকার করেছেন।

বক্তব্য বিকৃতি:

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গির সাহেব সহ অন্যান্য সালাফীরা সর্বদা প্রচার করে থাকেন, তারা কুরআন-সুন্নাহ ও ইমামগণের বক্তব্যের আক্ষরিক অর্থে বিশ্বাস করেন। এগুলোকে তা'বীল বা ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিকৃত করেন না। এধরণের তা'বীল করার কারণে তারা অন্যদেরকে জাহমী-মুতাজেলীও বলে থাকেন। অথচ আমরা দেখছি, ইমাম শাফেয়ীর নামে উল্লেখিত জাল বর্ণনাটির বক্তব্যটি আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গির সাহেব তা'বীল করেছেন। **সাধারণত: আরবী ফি শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল ভেতরে বা মধ্যে। কিন্তু কখনও কখনও রুপক হিসেবে ফি শব্দটি উপরের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কুরআন - সুন্নাহে এধরণের রুপকের ব্যবহার রয়েছে।**

উপরের বক্তব্যে স্যার সরাসরি রুপক অর্থটিই নিয়েছেন। স্যারের নিজের বক্তব্য ও অন্যান্য সালাফীদের বক্তব্য অনুযায়ী এভাবে রুপক অর্থ নেয়া জাহমিয়াদের কাজ ও মূল বক্তব্যের বিকৃতি। স্যার 'আসমানে' বা আকাশে এ শব্দের রুপক অর্থ করেছেন আসমানের উর্ধ্বে। যা তাদের মূলনীতি অনুযায়ী সুস্পস্ট বিকৃতি।

<u>আক্বিদাগত কুফুরী:</u>

ইমাম শাফেয়ী রহ: এর নামে উপরের জাল বর্ণনাটি মূলত: একটি কুফুরী আক্বিদা সাব্যস্ত করেছে। এই কুফুরী আক্বিদাটি মূলত: খ্রিষ্টানদের আক্বিদা। খ্রিষ্টানরা আল্লাহ তায়ালাকে আকাশে বা আসমানে বিশ্বাস করে এবং তারা বিশ্বাস করে তিনি আকাশে তার থ্রোন বা সিংহাসনে রয়েছেন।

এই খ্রিষ্টীয় আক্বিদাটি মূলত: ইমাম শাফেয়ী রহ: এর নামে জাল করা হয়েছে। অথচ এটি একটি সুস্পষ্ট কুফুরী আক্বিদা। **হানাফী মাজহাবের বিখ্যাত ফতোয়ার কিতাব ফতোয়ায়ে আলমগীরিতে রয়েছে, কেউ যদি আল্লাহ তায়ালাকে আকাশে বিশ্বাস করে তবে সে কাফের হয়ে যাবে।**
[ফতোয়ায়ে আলমগীরি বা আল-ফতোয়াল হিন্দিয়া, খ.২, পৃ.২৫৯]

মূল বক্তব্যে যেহেতু আকাশে বা আসমানে বললে স্পষ্ট কুফুরী হয়, এজন্য জাহাঙ্গির সাহেব মূল বক্তব্যে 'ফি' শব্দকে রুপক অর্থে নিয়েছেন। এতে তিনি সরাসরি কুফুরী না করলেও মূল আরবী বক্তব্যের উপর আপত্তি কিন্তু রয়েই যায়। একে তো বক্তব্যটি জাল আবার এতে খ্রিষ্টীয় কুফুরী আক্বিদা রয়েছে।

<u>আল্লাহ তায়ালা নিজ সিংহাসনে আকাশে রয়েছেন, এধরণের আক্বিদা খ্রিষ্টীয় কুফুরী আক্বিদা।</u> এধরণের বক্তব্য ইমামগণের নামে প্রচার করা সীমাহীন অন্যায় কাজ। মূল বক্তব্যকে অনুবাদের ক্ষেত্রে বিকৃত করা তাদের নীতি অনুযায়ী জাহমিয়াদের কাজ। একটি কুফুরী জাল আক্বিদা ইমাম শাফেয়ী রহ: এর নামে প্রচার করা কতটা ভয়াবহ বিষয় একটু চিন্তা করা দরকার। এবং এটি করা হচ্ছে চার ইমামের অনুসরণের দাবী করে। নাউজুবিল্লাহ।

<u>আহলে সুন্নত ওয়াল জাম'আর মূলনীতি–১</u>

১। সত্ত্বাগতভাবে আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর মধ্যে আছেন বা সত্ত্বাগতভাবে সর্বত্র বিরাজমান বিশ্বাস করাটা কুফুরী।

২। সত্ত্বাগতভাবে আল্লাহ তায়ালা আকাশে বা আসমানে রয়েছেন, এটিও কুফুরী আক্বিদা।

৩। সত্ত্বাগতভাবে তিনি আরশে রয়েছেন বা আরশ আল্লাহর অবস্থানের জায়গা, এই বিশ্বাসও কুফুরী।

৪। স্থানের সাপেক্ষে আল্লাহ তায়ালা আরশের উর্ধ্বে রয়েছেন, এটিও কুফুরী আক্বিদা।

সঠিক আক্বিদা:

আল্লাহ তায়ালা তার অস্তিত্বের জন্য কোন সৃষ্টির মুখাপেক্ষী নন। কোন স্থান ছাড়াই তিনি বিদ্যমান। সব কিছু সৃষ্টির আগেও তিনি যেমন ছিলেন, এখনও আছেন। তার অস্তিত্বের জন্য কোন ধরণের মাখলুকের মধ্যে হুলুল বা অনুপ্রবেশের তিনি মুখাপেক্ষী নন। যে কোন মাখলুকের মধ্যে আল্লাহর হুলুল বিশ্বাস করা কুফুরী। মাখলুক আসমান হোক, জমিন হোক, গাছপালা হোক, আরশ - কুরসী হোক বা যে কোন প্রাণী। যেমন ইসা আ: বা হিন্দুদের মূর্তি। যে কোন ধরণের সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টাকে বিশ্বাস করা কুফুরী।

<u>আরশে ইস্তাওয়া এর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা</u>

প্রশ্ন:মুহতারাম, তাহলে এরূপ বর্ণনার ব্যাখ্যা কেমন হবে ?

ইমাম বুখারি রহিমাহুল্লাহর উস্তাদ, ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইউসুফ আল-ফিরইয়াবি রহিমাহুল্লাহ বলেন,

من قال إن الله ليس على عرشه فهو كافر

“যে ব্যক্তি বলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাঁর আরশের উপরে নয়, সে ব্যক্তি কাফের।**”**

[খালখু আফ'আলিল ইবাদ লিল-বুখারী, ২/৩৯]

[একজন সালাফি ভাই থেকে উদ্ধৃত করলাম। উত্তরটা জানা জরুরি।]

উত্তর:

১। **এখানে আরশে বা উপরে বলতে কী উদ্দেশ্য?** স্থানগত ভাবে? তাহলে এ বক্তব্যের বিপরীতে অসংখ্য ইমামের বক্তব্য রয়েছে যে, **আরশে থাকার অর্থ কখনও স্থানগত নয় যে, আল্লাহ তায়ালা আরশে অবস্থান করেন।** ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ, ইমাম খাত্তাবী, ইমাম বাইহাকী সহ অসংখ্য ইমামের বক্তব্য দেখান যাবে।

২। যদি উদ্দেশ্য নেয়া হয়, **স্থানগতভাবে আরশে বিশ্বাস না করলে কুফুরী, তাহলে এটি অকাট্যভাবে বাতিল। কারণ,আরশ মাখলুক।** আর মাখলুক হওয়ার অর্থই যেটা আগে ছিলো না, পরে অস্তিত্বে এসেছে। যখন আরশ ছিলো না, তখন কী আরশে বিশ্বাস না করলে কুফুরী ধরা হবে? যদি সেটা কুফুরী না হয়, তাহলে বোঝা গেল, এই বক্তব্যটি সব-সময় সঠিক নয়। যৌক্তিকভাবে আরশের ক্ষেত্রে এটা অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে, সেটি অনাদি নয়, সুতরাং উপরের বক্তব্যটি কুফুরী হওয়ার কোন সুযোগ নেই যখন আরশই ছিল না।

সুতরাং আরশের উপরে আল্লাহকে বিশ্বাস না করলে কুফুরী, এটি অকাট্যভাবে প্রমাণিত নয়। বরং আল্লাহ তায়ালা স্থান ও সময়ের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত, এটি অকাট্য।

৩। শিয়াদের মত আমরা ইসমাতে সালাফ এর আক্বিদা রাখি না।এজন্য যুগ হিসেবে সালাফ বলা হোক বা ব্যক্তি হিসেবে সালাফ, শিয়ারা যেমন তাদের ইমামদেরকে মা'সুম বা নিষ্পাপ মনে করে, আমরা সেভাবে করি না। এজন্য তাদের কারও একক বক্তব্য অকাট্য বিষয়ের বিপরীতে দলিল হতে পারে না। আর কেউ যদি অকাট্য বিষয়ের বিপরীতে ইজমার দাবী করে, সেটাও সঠিক নয়। কারণ, অকাট্য বিষয়ের বিপরীতে কখনও ইজমা হতে পারে না। ইজমার দাবী করলে সেটা মিথ্যা দাবী হিসেবে পরিগণিত হবে।

৪।**আল্লাহ ﷻ স্থান ও সময়ের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হওয়ার বিষয়টি অকাট্য।** এর বিপরীতে অন্য কারও বক্তব্য সঠিক হতে পারে না। তিনি সালাফ হোন বা পরবর্তী কেউ। খ্রিষ্টানদের সালাফরা অকাট্য বিষয়ের বিপরীতে ত্রিত্ববাদ চালু করেছিল আর খ্রিষ্টানদের অনেকে সেটা মেনে নিয়েছে। আমাদের সাথে তাদের পার্থক্য হল, সালাফের দোহায় দিয়ে আমরা খ্রিষ্টানদের মতো অকাট্য বিষয়ের বিপরীতে সালাফের বক্তব্যকে গ্রহণ করি না। অকাট্য বিষয়ের বিরোধিতা ছাড়া সালাফের বুঝের গুরুত্ব অবশ্যই আছে। কিন্তু কেউ যদি সালাফের নাম নিয়ে বলে, সালাফ বলেছেন দুই আর দুই পাচ, তাহলে আমরা সেটা কখনও মানতে পারি

না। মোটকথা, সালাফের কারও বক্তব্যই অকাট্য বিষয়ের বিপরীতে দলিল হতে পারে না। সম্ভাব্য বা জন্নী বিষয়ের ক্ষেত্রে তাদের বুঝকে আমরা গুরুত্ব দিব।

আইম্মায়ে মাযহাবের ব্যাপারে ড. সাহেবের বিকৃত উপস্থাপনা:পর্ব ২

চার ইমামের নামে মরহুম খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গির সাহেবের ভ্রান্ত আক্বিদা প্রচার (২য় পর্ব):

গত পর্বে আমরা '**কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আক্বিদা**' বইয়ের ভূমিকা থেকে দেখিয়েছিলাম যে, মরহুম ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গির সাহেব চার ইমাম আক্বিদার উপর থাকতে চেয়েছেন। তিনি এও দাবী করেছেন যে, তাদের থেকে সহীহ আক্বিদাগুলো উল্লেখ করবেন। কিন্তু দু:খজনকভাবে আমরা দেখেছি যে, তিনি ইমাম শাফেয়ী রহ: এর নামে জাল করা একটি কুফুরী বক্তব্য তার মতের স্বপক্ষে উল্লেখ করেছেন এবং সেখানে তাদের চিরাচরিত দাবীর বিপক্ষে গিয়ে জাহমীদের মতো রুপক অর্থও নিয়েছেন।

আজকের আলোচনায় আমরা দেখব, তিনি ইমাম মালেক রহ: এর নামেও একটি প্রচলিত ভুল বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তিনি যে শব্দে বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন, এই শব্দে বর্ণনাটি কোথাও পাওয়া যায় না। বরং এটি মানুষের মুখে প্রচলিত একটি ভুল বক্তব্য। শব্দের দিক থেকে আরবী শব্দটি যেমন প্রচলিত ভুল, এই বর্ণনার বক্তব্যগুলোও খুবই ভ্রান্তিকর। অথচ সালাফী আক্বিদার কারণে তিনি এই প্রচলিত ভুল শব্দটিই ইমাম মালিকের নামে উল্লেখ করেছেন। যেহেতু এই শব্দে কোন রেওয়াত পাওয়া যায় না, বরং এটি একটি প্রচলিত ভুল সুতরাং এধরণের বক্তব্য উল্লেখ করা স্যারের ভূমিকার দাবীর সাথে সাংঘর্ষিক। এছাড়া বক্তব্যটি ইমাম মালেক রহ: এর থেকে বর্ণিত বিশুদ্ধ বর্নণাগুলোর বিপরীত এবং এতে আক্বিদাগত বড় ধরণের আপত্তিকর বক্তব্য রয়েছে।

ইমাম মালিক রহ: এর নামে প্রচলিত ভুল বর্ণনা প্রচার:

মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে একটি বিষয় বুঝে নেয়া দরকার। সেটি হল শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থে 'কাইফ' বা 'কাইফিয়াত' এর পরিচয়। কারণ, এ শব্দটি ইসলামী আক্বিদায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হাজার হাজার ইমাম ও সালাফের আক্বিদা সংক্রান্ত বক্তব্যে এটি এসেছে।

আরবীতে কাইফ শব্দটি মূলত: অবস্থা, ধরণ ইত্যাদি বোঝায়। আরবী কথোপকথনে বলা হয়, কাইফা হালুকা (তুমি কেমন আছো বা তোমার অবস্থা কী?)

পরিভাষায় কাইফ বলা হয় সময়ের সাথে কোন কিছুর অবস্থা বা ধরণের পরিবর্তন। অর্থাৎ সময়ের সাপেক্ষে কোন কিছুর কতটুকু পরিবর্তন হল, সেটি বোঝার জন্যই কাইফ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কখনও কখনও কোন কিছুর হাকীকত বা বাস্তবতা বোঝানোর উদ্দেশ্যও এর ব্যবহার রয়েছে।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের একটি অকাট্য মৌলিক আক্বিদা হল, আল্লাহ তায়ালার কোন কাইফ নেই বা সময়ের সাপেক্ষে তার সত্ত্বা বা গুণের কোন পরিবর্তন হয় না। কারণ আল্লাহ তায়ালা সময়ের সাপেক্ষে যে কোন ধরণের পরিবর্তন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তিনি সময়ের স্রষ্টা। সময়ের সীমাবদ্ধতা থেকে তিনি মুক্ত। সময়ের পরিবর্তনের কারণে আল্লাহর কোন পরিবর্তন হয় না। এজন্য আল্লাহর সত্ত্বা ও গুণাবলী কাইফ থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

আল্লাহর সত্ত্বা ও গুণাবলী সময়ের সাপেক্ষে সব ধরণের পরিবর্তন বা কাইফ থেকে মুক্ত হওয়ার বিষয়ে আহলে সুন্নতের সকলেই একমত। এ বিষয়ে অসংখ্য সালাফের বক্তব্য রয়েছে। যেখানে তারা যে কোন গুণের ক্ষেত্রে 'বিলা কাইফ' বা কাইফ মুক্ত অবস্থায় সেটি বিশ্বাস করতে বলেছেন।

আহলে সুন্নতের উক্ত আক্বিদার বিপরীতে দেহবাদীরা নতুন একটি ধারণার প্রবর্তন করেছে। তারা বলে, আল্লাহর সিফাতের কাইফ আছে কিন্তু সেটি অজানা বা অজ্ঞাত।

তারা মূলত: দেহবাদী ফেরকা কাররামিয়া ও সালেমিয়্যা ফেরকার অনুসরণ করার কারণে আল্লাহর সত্ত্বা ও গুণে পরিবর্তনে বিশ্বাস করে।

মোটকথা আহলে সুন্নতের বক্তব্য হল, আল্লাহর যাত ও সিফাতের ক্ষেত্র 'কাইফ' (সময়ের সাথে অবস্থার পরিবর্তন) প্রযোজ্য নয়।**বাতিল ফেরকার লোকেরা বলে, আল্লাহর কাইফ আছে, কিন্তু এর ধরণ অজানা বা অজ্ঞাত।**

আহলে সুন্নতের মতে আল্লাহর কোন গুণের জন্য কাইফ সাব্যস্ত করাটাই ভ্রান্তি ও কুফুরী। এখানে জানা বা অজানার প্রশ্নই আসবে না। কারণ আল্লাহ তায়ালা সব ধরণের পরিবর্তন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

তাইমি—সালাফীদের আক্বিদাগত বড় ধরণের একটি ভ্রান্তি হল, আল্লাহর জন্য 'কাইফ' সাব্যস্ত করা এবং সেটাকে অজ্ঞাত বলা। আর এই ভ্রান্তির স্বপক্ষে তারা ইমাম মালিক রহ: এর নামে একটি প্রচলিত ভুল বক্তব্য প্রচার করে থাকে।

'কাইফ' থেকে মুক্ত হওয়ার বিষয়ে সালাফের বক্তব্য:

১. ইমাম বায়হাকী রাহি. ওয়ালিদ বিন মুসলিম থেকে বর্ণনা করেন,

سُئِل الأوزاعي ومالك وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي جاءت في التشبيه، فقالوا: أمرُّوها كما جاءت بلا كيفية

অর্থাৎ **আওজায়ী, মালিক, সুফিয়ান, লাইস বিন সাদকে আল্লাহর তাশবিহ সংক্রান্ত হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলেন, এগুলোর কাইফ ব্যতীত যেভাবে এসেছে, সেভাবে চালিয়ে দাও [বর্ণনা করো]। আস সুনানুল কুবরা: ২/৩।**

২। ইমাম তিরমীজী রহ: লিখেছেন,

هَكَذَا رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ المُبَارَكِ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ: أَمِرُّوهَا بِلَا كَيْفٍ "، **وَهَكَذَا قَوْلُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ**،

অর্থাৎ এমনটি বর্ণিত হয়েছে মালিক, সুফিয়ান বিন উয়াইনা এবং আবদুল্লাহ বিন মুবারক রাহি. থেকে। এ সমস্ত ব্যাপারে তারা বলেন, কোন ধরণের কাইফ ছাড়া এগুলো চালিয়ে দাও [বর্ণনা করো]। **এমনটাই হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মত।** তিরমিযী: হাদীস নং ৬৬২।

এভাবে হাজার হাজার ইমাম সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, আল্লাহর সিফাতে বিশ্বাস করতে হবে কাইফ ছাড়া।বিলা কাইফ।

সালাফের এধরণের অসংখ্য বক্তব্যের বিপরীতে তাইমী - সালাফীরা বলে,কাইফ আছে কিন্তু অজ্ঞাত। যা মারাত্মক ভ্রান্তি ও সালাফের আক্বিদা বিরোধী।

আশ্চর্য্যের বিষয় হল, স্যার সালাফের অনুসরণের দাবী করলে অসংখ্য সালাফের বক্তব্যের বিপরীতে কাইফ বা ধরণ সাব্যস্ত করে তা অজ্ঞাত, এ মতটি তার বইয়ের বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করেছেন।

ইমাম মালেক রহ: এর নামে প্রচলিত ভুল বক্তব্য:

মরহুম আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গির সাহেব তার **'আল-ফিকহুল আকবর'** বইয়ের ২৫৮ পৃষ্টায় লিখেছেন,

“ইমাম আযমের এ বক্তব্য উল্লেখ করে মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী বলেন, এ বিষয়ে ইমাম মালিক রহ: খুবই ভালো কথা বলেছেন| তাকে আল্লাহর আরশের উপর ইস্তিওয়া বা অধিষ্ঠান বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন,

الاستواءُ معلومٌ **والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة** والإيمان به واجب

"ইস্তিওয়া বা অধিষ্ঠান পরিজ্ঞাত, **এর পদ্ধতি বা স্বরুপ অজ্ঞাত, এ বিষয়ে প্রশ্ন করা বিদয়াত** এবং এ বিষয়ে বিশ্বাস করা জরুরি**”|**

আমরা উপরেই বলেছি,ইমাম মালিক রহ: এর এ বক্তব্যটি এই শব্দে বর্ণিত হয়নি| বরং এটি একটি ভুল প্রচলন| স্যার যেহেতু ইমামগণের সঠিক আক্বিদা তুলে ধরতে চেয়েছেন,সেক্ষেত্রে বিষয়টি তাহকীক করা জুরুরি ছিল| অন্তত: কোন প্রচলিত ভুল বক্তব্য আসাটা মোটেও সমীচীন নয়|

ইমাম মালিক রহ: এর সঠিক বক্তব্য:

উপর্যুক্ত বক্তব্য সম্পর্কে ইমাম মালিক রহ: থেকে প্রায় দশটি বর্ণনা পাওয়া যায়| এর মধ্যে একটি বর্ণনা উপরের বর্ণনার কাছাকাছি| তবে এটি দুর্বল| বিশুদ্ধতার বিচারে অন্যান্য বর্ণনাগুলো সহীহ এবং সেখানে আল্লাহর কাইফকে নাকচ করা হয়েছে|

ইমাম মালিক রহ: এর ছাত্র আব্দুল্লাহ ইবনে ওহাবের বর্ণনাটি বিশুদ্ধ| **ইমাম যাহাবি আল উলুতে** এ বর্ণনাকে বিশুদ্ধ বলেছেন| ইবনে হাজার আসকালানী এর সনদকে ‘জাইয়্যিদ’ বলেছেন|

ইমাম বাইহাকি রহ: বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন এভাবে,

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أحمد بن محمد بن إسماعيل بن مهران، ثنا أبي، حدّثنا أبو الربيع بن أخي رشدين ابن سعد قال: سمعت عبد الله بن وهب يقول: كنا عند مالك بن أنس فدخل رجل فقال: يا أبا عبدالله " الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى" كيف استواؤه؟، قال: فأطرق مالك وأخذته الرحضاء، ثم رفع رأسه فقال: " الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه، ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، وأنت رجل سوء صاحب بدعة أخرجوه، قال: فأُخرج

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনে ওহাব রহ: বলেন, আমরা ইমাম মালিক রহ: এর মজলিশে উপস্থিত ছিলাম| এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আবু আব্দিল্লাহ, আল্লাহ তায়ালা আরশে ইস্তিওয়া করেছেন, তার ইস্তিওয়া কেমন? ইবনে ওহাব রহ: বলেন, একথা শুনে ইমাম মালিক রহ: মাথা নিচু করে ফেললেন| ঘর্মাক্ত হয়ে গেলেন| এরপর মাথা উচু করে বললেন, রহমান আরশে ইস্তিওয়া করেছেন যেমনটি

তিনি নিজের সম্পর্কে বলেছেন।আল্লাহর গুণের ক্ষেত্রে 'কাইফা' শব্দটি বলা যাবে না।কারণ তিনি কাইফ থেকে মুক্ত।তুমি একজন নিকৃষ্ট লোক ও বিদয়াতী।তোমরা তাকে বের করে দাও। এরপর তাকে মজলিশ থেকে বের করে দেয়া হল।

প্রচলিত ভুল বর্ণনা থেকে এ বর্ণনার মৌলিক পার্থক্য খুবই স্পষ্ট। এ বর্ণনায় ইমাম মালিক রহ: স্পষ্ট করেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা কাইফ থেকে মুক্ত। কাইফ আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য নয়। অথচ প্রচলিত ভুল বর্ণনায় আল্লাহর জন্য কাইফ সাব্যস্ত করে তা অজ্ঞাত বলা হয়েছে। যা আহলে সুন্নত ও অন্যান্য সালাফের আক্বিদার সুস্পষ্ট বিপরীত।

ইমাম মালিক রহ: থেকে বর্ণিত অন্যান্য শব্দগুলোর অধিকাংশতেই আল্লাহর জন্য কাইফকে নাকচ করা হয়েছে। কোথাও তিনি বলেছেন,

الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول

অর্থাৎ ইস্তিওয়া অজ্ঞাত নয় এবং কাইফ আল্লাহর জন্য যৌক্তিক নয়।

মোটকথা উপরের প্রচলিত ভুল বর্ণনার কাছাকাছি একটি দুর্বল বর্ণনা পাওয়া গেলেও উপরের বর্নণাটি নিতান্ত ভুল। ইমাম মালিক সহ অসংখ্য সালাফের বক্তব্যের বিপরীত। উপরের বক্তব্যে আল্লাহর কাইফ সাব্যস্ত করা হয়েছে। অথচ বাকী প্রায় ৯ টা বর্ণনায় কাইফকে নাকচ করা হয়েছে এবং অন্যান্য বর্ণনাগুলো সনদের বিচারে শক্তিশালী।
স্যার যেহেতু বিশুদ্ধ আক্বিদা প্রচারের উদ্দেশ্যে তার কিতাবগুলে সংকলন করেছেন, তার জন্য এধরণের একটি প্রচলিত ভুল বক্তব্য প্রচার করা কাম্য ছিল না।

ইমাম মালিক রহ. এর নামে আরেকটি আক্বিদা প্রচার

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব ইমাম মালেক রহ. সম্পর্কে লিখেছেন,ইমাম মালেক রহ. বলেন,
"আল্লাহ আসমানে (উর্ধ্বে) এবং তার জ্ঞান সকল স্থানে। কোন স্থানই মহান আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে নয়"

উক্ত বর্ণনার সনদ বিশ্লেষণ:

ইমাম মালিক থেকে উক্তিটি বর্ণনা করেছে আব্দুল্লাহ ইবনে নাফে। আব্দুল্লাহ ইবনে নাফে থেকে বর্ণনা করেছে,সুরাইজ ইবনে নু'মান। সুরাইজ ইবনে নু'মান থেকে অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন।

ইমাম মালিক রহ. থেকে আব্দুল্লাহ ইবনে নাফে এককভাবে বর্ণনাটি উল্লেখ করেছে। এ বর্ণনার কোন মুতাবি বা শাহিদ বর্ণনা নেই।

আব্দুল্লাহ ইবনে নাফে সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের অভিমত:
১. **ইমাম যাহাবী** তার সম্পর্কে বলেছেন,

ضعفوه

মুহাদ্দিসগণ তাকে **যয়ীফ বা দুর্বল** সাব্যস্ত করেছেন।
২. ইমাম **আলী ইবনুল মাদিনী** বলেন,

روي مناكير

সে **মুনকার হাদীস** সমূহ বর্ণনা করতো।
৩. ইমাম বোখারী রহ. তাকে **মুকারুল হাদীস** বলেছেন।
৪. ইমাম নাসায়ী রহ. তার সম্পর্কে বলেন,

متروك

সে পরিত্যক্ত।
[সূত্র: আল-কাশিফ, ইমাম যাহাবী রহ., পৃ.৬০৩]

অধিকাংশ মুহাদ্দিস তার হেফজ বা স্মৃতিশক্তি দুর্বল হওয়ার কথা লিখেছেন। অনেকে তার শেষ জীবনে ভ্রমগ্রস্ত হওয়ার কথা বলেছেন।

(قال الإمام أحمد) عبد الله بن نافع الصائغ لم يكن صاحب حديث وكان ضعيفا فيه وأنه لا يُعتمد عليه
.

ইমাম আহমাদ রহ: বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে নাফে আস-সায়েগ হাদীস শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন না, তিনি হাদীসে দুর্বল ছিলেন। হাদীসের ক্ষেত্রে তার উপর নির্ভর করা যায় না।

قال ابن عدي يروي غرائب عن مالك

ইমাম ইবনে আদী বলেন, তিনি ইমাম মালিক থেকে গারীব পর্যায়ের বিভিন্ন বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

মূলত: আব্দুল্লাহ ইবনে নাফে এর উক্ত বর্ণনাটি ইমাম মালিক রহ. থেকে সুপ্রমাণিত বক্তব্যের বিপরীত। ইমাম মালিক রহ. কে ইস্তেওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করার কারণে তিনি ঘর্মাক্ত হয়ে যান। এবং প্রশ্নকারীকে তিনি বিদ'আতি আখ্যায়িত করেন। সুতরাং ইমাম মালিক রহ. কখনও একথা বলতে পারেন না যে আল্লাহ আসমানে রয়েছেন। তার যদি এটিই আকিদা হতো, তাহলে তিনি ঘর্মাক্তও হতেন না বা তাকে বিদয়াতীও বলতেন না।

সালাফী শায়খরা বর্ণনাটিকে সহীহ বলেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে নাফে এর ব্যাপারে কিছু কিছু ইমামের তাউসীককে প্রাধান্য দিয়ে তারা বর্ণনাটিকে সহীহ বলেছেন। এক্ষেত্রে সালেহ আল-মুনাজ্জিদ ও শায়খ আলবানী এমতটি উল্লেখ করেছেন।

বিপরীতে বিখ্যাত মুহাদ্দিস ওহবী সুলাইমান গাউজী আল-বানী বলেছেন,

وقال العلامة وهبي سليمان غاوجي الألباني في شرحه لكتاب إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لبدر الدين بن جماعة (ص 82 طبعة دار السلام الطبعة الأولى ، 1990 ، بتحقيق وهبي سليمان غاوجي الألباني) في فصل تحت عنوان " دعاوى خطيرة ليس لها دليل شرعي" ، ما نصه : (وما يرويه سريج بن النعمان عن عبد الله بن نافع عن مالك أنه كان يقول : " الله في السماء وعلمه في كل مكان " . لا يثبت .قال الإمام أحمد : عبد الله بن نافع الصايغ لم يكن صاحب حديث وكان ضعيفا فيه

.

قال ابن عدي : يروي غرائب عن مالك . وقال ابن فرحون : كان أصم أميا لايكتب . وبمثل هذا السند لا ينسب إلى مثل مالك مثل هذا وقد تواتر عنه عدم الخوض في الصفات وفيما ليس تحته عمل كما كان عليه أهل المدينة على ما في شرح السنة للألكائي وغيره

তার বক্তব্যের সার কথা হল, এধরণের সনদের মাধ্যমে ইমাম মালিক থেকে এজাতীয় বক্তব্য প্রমাণ করা সিদ্ধ নয়। কারণ ইমাম মালিক রহ: এর থেকে মুতাওয়াতির বর্ণনা হল, তিনি সিফাত বিষয়ক আলোচনায় প্রবৃত্ত হতেন না।

মোটকথা, এই বর্ণনা সম্পর্কে আমরা সর্বোচ্চ বলতে পারি, এটি মুখতালাফ ফি বা মতবিরোধপূর্ণ। সুতরাং এজাতীয় বক্তব্য দ্বারা আল্লাহর আকাশে থাকার মতো একটি বাতিল আক্বিদা সাব্যস্ত করাটা প্রশ্নবিদ্ধ। কারণ, স্যার নিজেও আল্লাহ তায়ালাকে আকাশে বিশ্বাস করেন না। এজন্য তিনি রুপক অর্থটি ব্র্যাকেটে লিখে দিয়েছেন।

এ বক্তব্যের উপর আরেকটি শক্ত আপত্তি হল, বক্তব্যের দ্বিতীয় অংশ। এখানে বলা হয়েছে, আল্লাহর ইলম সব জায়গায়। কোন জায়গা আল্লাহর ইলম থেকে খালি নয়। একথাটিও বাহ্যিকভাবে ভুল। কারণ, ইলম আল্লাহর একটি সত্ত্বাগত গুণ। আল্লাহর ইলমকে সব জায়গায় বলা আর আল্লাহকে সব জায়গায় বলা একই । কারণ জাত ও সিফাত কোন পৃথক অস্তিত্ব নয়। একারণে এর দ্বারা সর্বত্র বিরাজমানের আক্বিদা প্রমাণিত হয়। যা সালাফীদের নিকট কুফুরী।

কেউ হয়ত বলবে, আল্লাহর ইলম সব জায়গায় এর অর্থ হল, আল্লাহ সব কিছু জানেন। তাহলে উপরের বাক্যটিকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। এধরণের ব্যাখ্যা সালাফীদের নিকট নিন্দনীয়। আবার এটাও একটা প্রশ্ন যে, আল্লাহ তায়ালা সর্ব বিষয়ে অবগত, যা কুরআনে এসেছে, এর বিপরীতে আল্লাহর ইলম সব জায়গায় রয়েছে, এধরণের বক্তব্য কতুটুকু সিদ্ধ? কারণ, সালাফীদের

আরেকটি মূলনীতি হল, কুরআনে - সুন্নাহে যেভাবে আছে, সেভাবে বিশ্বাস করতে হবে, এখানে নিজের থেকে কোন কিছু বৃদ্ধি করা যাবে না। তাহলে এটা কীভাবে বলা সঠিক হয় যে, কোন জায়গা আল্লাহর ইলম থেকে খালি নয়?

মোটকথা, ব্যাখ্যা ছাড়া বললে আল্লাহর ইলম সবজায়গায় বলে কি প্রকারান্তরে আল্লাহকেই সর্বত্র বিরাজমান বলা হচ্ছে না?

সবচেয়ে বড় জিজ্ঞাসা:

যদি মেনে নেই যে, ইমাম মালিক রহ. বলেছেন, আল্লাহ আকাশে রয়েছেন।আমরা জাহাঙ্গীর সাহেবসহ সকল সালাফীকে প্রশ্ন করতে চাই, আপনারা কি ইমাম মালিক রহ. এর এ কথা বিশ্বাস করেন?

যদি বলেন , হ্যা, আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ আসমানে রয়েছেন, তাহলে এবার নীচের ফতোয়াটি লক্ষ্য করুন।
ইবনে তাইমিয়া বলেন,

فمن اعتقد أنّ الله فِي جوف السّمَاء محصور محاط به......فَهُوَ ضال مبتدع جاهل

কেউ যদি বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তায়ালা আসমানে রয়েছেন, আসমান দ্বারা পরিবেষ্টিত বা আবদ্ধ রয়েছেন, তবে সে পথভ্রষ্ট, বিদ'আতি, মূর্খ''।
[মাজমু'আ ফাতাওয়া, খ.৫, পৃ.২৫৮]

সুতরাং আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব যদি বলেন যে,তিনি ইমাম মালিক রহ. এর উক্ত বক্তব্যে বিশ্বাস করেন যে,আল্লাহ তায়ালা আসমানে বা আকাশে রয়েছেন,তাহলে তিনি পথভ্রষ্ট ও বিদয়াতী প্রমাণিত হবেন।

আর যদি বলেন, আমরা এটি বিশ্বাস করি না যে, আল্লাহ আসমানে রয়েছেন, তাহলে তিনি ইমাম মালিক রহ. উক্ত বক্তব্য কীভাবে উদ্ধৃত করেন? তিনি নিজেই যেটা বিশ্বাস করেন না, সেটার প্রতি অন্যজনকে কেন দাওয়াত দেন?

ইমাম মালিক রহ. এর বক্তব্যের বিকৃতি ড.খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব তার **"কুরআন সুন্নাহের আলোকে ইসলামী আকিদা"** ও **"আল-ফিকহুল আকবার"** এর বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যার অসংখ্য জায়গায় একটি বিষয় ***সীমাহীন গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেছেন। বিষয়টি হলো, আল্লাহর গুণের ক্ষেত্রে তা'বীল বা ব্যাখ্যা করা যাবে না। কুরআন সুন্নাহের আলোকে ইসলামী আকিদা বইয়ে তিনি তা'বীল বা ব্যাখ্যা করাকে বিদয়াত বলেছেন।*** আল-ফিকহুল আকবারের বিভিন্ন জায়গায় তিনি বলেছেন, কোন গুণের তা'বীল বা রুপক অর্থে গ্রহণ সেটিকে অস্বীকার করা বা সেটিকে বাতিল করার নামান্তর।
তা'বীল বা ব্যাখ্যা করার কারণে সালাফীরা আশআরী-মাতুরী উলামায়ে কেরামকে কাফির পর্যন্ত বলে থাকে। **এমনকি ইমাম বোখারী সূরা কাসাসের ৮৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যার কারণে তার এই ব্যাখ্যাকে নাসীরুদ্দীন আলবানী বলেছে, এটি**

কোন মু’মিন মুসলমানের কথা হতে পারে না। ইমাম বোখারীর বক্তব্যকে কুফুরী মতবাদ তা’তিল (আল্লাহর গুণ অস্বীকার) আখ্যায়িত করেছেন নাসীরুদ্দীন আলবানী।

আল্লাহর সিফাত বা গুণের ক্ষেত্রে তা’বীলকে সালাফীরা কুফুরী, বিদয়াত,জাহমিয়া,মুয়াত্তিলা ইত্যাদি আখ্যায়িত করে থাকেন। অথচ প্রয়োজনের সময় অসংখ্য জায়গায় তারা নিজেরাও রুপক অর্থ নিয়ে থাকেন। এসব সালাফী ভাইয়েরা নিজেদের রুপক অর্থ গ্রহণকে কখনও কুফুরী,বিদয়াতী বা জাহমিয়া-মুয়াত্তিলাদের কাজ বলে উল্লেখ করেন না। নিজেদের ব্যাখ্যা সম্পর্কে কখনও বলেন না যে, এটি বক্তব্যের বিকৃতি, বা অস্বীকার।

ইমাম মালিক রহ. বলেছেন,“আল্লাহ আসমানে বা আকাশে রয়েছেন।”

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব ফি শব্দের একটি রুপক অর্থ নিয়েছেন,উর্ধ্বে।এই রুপক অর্থ তিনি **আল-ফিকহুল আকবারের** বিভিন্ন জায়গায় লিখেছেন। ইমাম মালিক রহ. এর বক্তব্যের ক্ষেত্রে এই রুপক অর্থকে তিনি ব্র্যাকেটে উল্লেখ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা রহ. এর বক্তব্যের ক্ষেত্রে শুধু রুপক অর্থটিই রেখেছেন। **জাহাঙ্গীর স্যার বা সালাফী মতবাদের অনুসারীদেরক কাছে আমাদের প্রশ্ন হলো, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত তথা আশআরী-মাতুরী আলেমগণ ব্যাখ্যা করলে, সেটা ওহীর বিকৃতি, অস্বীকার হয়, সেটা কুফুরী হয়, সেটা অমুসলিমদের বক্তব্য হয়ে যায়, অথচ আপনারা যেসব রুপক অর্থ নিয়ে থাকেন, এর দ্বারা কি বক্তব্যের বিকৃতি হয় না?** আপনাদের রুপক অর্থ কি এতটাই পূন্যের হয়ে গেছে সেটা নিন্দনীয় হয় না? আমাদেরটা কুফুরী হলেও আপনাদেরটা ঠিকই সহীহ আকিদার হয়ে যায়?

সুতরাং স্যার তার নিজের ফতোয়া অনুযায়ী ইমাম মালিক রহ. সহ অন্যান্য ইমামের বক্তব্য বিকৃত বা অস্বীকার করে জাহমীদের কাজ করেছেন।

প্রশ্নোত্তরের আলোকে আল্লাহর সিফাত সম্পর্কে সালফে-সালেহীনের আক্বিদা:পর্ব ১

১। আল্লাহ তায়ালা সব ধরণের অঙ্গ-প্রতঙ্গ থেকে মুক্ত। অঙ্গ-প্রতঙ্গের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র।

২। আল্লাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয়। তিনি দেহ ও অঙ্গ-প্রতঙ্গ বিশিষ্ট নন। সৃষ্টি যেমন বিভিন্ন অংশ মিলে গঠিত হয়, আল্লাহ তায়ালা এধরণের অংশ অংশ মিলে গঠিত হওয়ার ধারণা থেকে মুক্ত। ছোট বা বড় কোন ধরণের অংশের ধারণা সম্পূর্ণ তাউহীদ পরিপন্থী ও কুফুরী।

৩। কুরআন ও সুন্নাহের কিছু কিছু শব্দ আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে যেগুলো সাধারণত: অংশ বা অঙ্গ বোঝায়। এগুলোর বিষয়ে আহলে সুন্নতের সর্বসম্মত ঐকমত্যপূর্ণ মতামত হল, এগুলো আল্লার ক্ষেত্রে অংশ বা অঙ্গ প্রমাণ করে না। এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর জন্য

অংশ বা অঙ্গ সাব্যস্ত করা সুস্পষ্ট কুফুরী। যেমন, **আল্লাহর রং (সিবগাতুল্লাহ), আল্লাহর চেহারা(ওয়াজহুল্লাহ), আল্লাহর হাত (ইয়াদুল্লাহ)।**

প্রশ্ন: এগুলো থেকে আল্লাহর অংশ বা অঙ্গ সাব্যস্ত করা যদি কুফুরী হয়, তাহলে পবিত্র কুরআনে এগুলো ব্যবহার করা হয়েছে কেন?

উত্তর: পবিত্র কুরআন যেহেতু আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং আরবী ভাষার অলংকার খুবই উচ্চাঙ্গের, এজন্য পবিত্র কুরআন অলঙ্কারের শাস্ত্রের দিক থেকে সবার উপরে।

ভাষা ও সাহিত্যে অঙ্গ ও অংশের অর্থ নেয়া ছাড়াও এজাতীয় শব্দ ব্যবহার করা যায়। যেমন, **কুরআনে আছে দিনের চেহারা (ওয়াজহান নাহার)। অথচ আমরা জানি, রাত-দিনের কোন চেহারা হয় না। এটা সাহিত্যের অলঙ্কার।**

কুরআনে আছে, **সত্যের পা (কাদামা সিদক)।** আমরা সবাই জানি, সত্য-মিথ্যার কোন হাত-পা হয় না। এরপরও ভাষার অলঙ্কারের হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

কুরআনে আছে, **পিতা-মাতার জন্য নম্রতার ডানা (জানাহাজ জুল) বিছিয়ে দাও।** অথচ আমরা জানি,নম্রতার কোন ডানা হয় না।
সুতরাং আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উচ্চাঙ্গের অলঙ্কারের কারণে এধরণের ব্যবহার থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। এগুলো কোন দোষণীয় বিষয় নয়।

বরং এগুলো কুরআনের সৌন্দর্য্য। কারণ, যখন বলা হয়, তোমরা আল্লাহর রঙে রঙীন হও, তখন যে মর্ম ও উদ্দেশ্য বোঝান হয়, স্বাভাবিকভাবে বললে এতো অর্থবোধক হয় না। যদি বলি, তোমরা ভালো গুণে গুণান্বিত হও, তাহলে এটা অতটা আবেদনময় হয় না।

আগের উদাহরণে পিতার জন্য নম্রতার ডানা বিছিয়ে দেয়ার কথাটাই ধরুণ। সরল-স্বাভাবিকভাবে যদি বলা হয়, তোমরা পিতা-মাতার সাথে ভালো আচরণ করো, এটা যতটুকু আবেদনময়, এর চেয়ে শতগুণ অর্থবহ হলো, তোমরা পিতা-মাতার সামনে দয়া-মায়া ও নম্রতার ডানা বিছিয়ে দাও।

এজন্য, একথা ভাবা কখনও উচিৎ হবে না যে, যেসব বিষয় নিয়ে বিতর্ক হয়, সেসব বিষয় পবিত্র কুরআনে আসলো কেন? নাউজুবিল্লাহ।

পবিত্র কুরআনের ক্ষেত্রে এধরণের আপত্তি বা ধারণা খুবই মারাত্মক। কারণ, যেটা পবিত্র কুরআনের সৌন্দর্য্য সেটাকে কুরআনের ত্রুটি বিবেচনা করা হচ্ছে। অথচ পবিত্র কুরআন সব -ধরণের দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত। এজন্য আমরা দেখি যে, এসব আয়াত ও বক্তব্যে সাহাবায়ে কেরাম কোন আপত্তি করেননি। কারণ তারা মাতৃভাষার অলংকার ও উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন।

প্রশ্ন: এসব শব্দের ক্ষেত্রে অংশ বা অঙ্গ বিশ্বাস না করে কি এগুলো আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা যায়?

উত্তর: এসব শব্দের বাহ্যিক, আক্ষরিক বা সরল অর্থ হল দেহের অংশ বা অঙ্গ। এজন্য অংশ বা অঙ্গের অর্থ বাদ দিলে বাহ্যিক বা আক্ষরিক আর কোন অর্থ অবশিষ্ট থাকে না।

যেহেতু বাহ্যিক সরল অর্থ তথা অংশ বা অঙ্গ অর্থটা সকলের মতে কুফুরী, এজন্য এই কুফুরী অর্থ বাদ দেয়ার পর এই শব্দগুলোর আর কোন সরল অর্থ অবশিষ্ট থাকে না, যা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা যায়।

এখন আমাদের সামনে দু'টি বিষয় থাকছে,

১। মূল শব্দ, যার বাহ্যিক অর্থকে বাদ দেয়া হয়েছে।

২। শব্দের অনেক রুপক অর্থ ও ব্যবহার।

এই পরিস্থিতিতে আলিমদের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে। কেউ বলেছেন, বাহ্যিক অর্থ বাদ দেয়ার পর মূল যে শব্দটা অবশিষ্ট থাকছে, এ শব্দকে আল্লাহর সিফাত বা গুণ বলা হবে। তবে এক্ষেত্রে আলাদা কোন অর্থ সাব্যস্ত করা হবে না।

প্রশ্ন হয়, অর্থহীন আবার শব্দ হয় নাকি? তখন তারা বলেন, অর্থটা আমাদের জানা নেই। আল্লাহ ভালো জানেন। একে পরিভাষায়, ইসবাত মায়াত তানজীহ বলে। অর্থাৎ বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করে শুধু শব্দটাকে সিফাত বা গুণ সাব্যস্ত করা।

আরেকদল আলিম বলেন, শব্দকে বাহ্যিক অর্থ থেকে বাদ দেয়ার পর আমাদের দায়িত্ব শেষ। আমরা আগ বেড়ে একে সিফাত বা গুণ বলব না আবার নাকচও করব না। এ বিষয়ে পুরো বিষয়টা আল্লাহর উপর ছেড়ে দিব। একে পরিভাষায় তাফয়ীদ মা'আততানজীহ (বাহ্যিক অর্থ বাদ দিয়ে শব্দকে আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়া) বলে।

প্রথম মতের সাথে দ্বিতীয় মতের পার্থক্যটা স্পষ্ট। প্রথম দল শব্দকে তার সরল অর্থ থেকে বাদ দেয়ার পর নিজেদের পক্ষ থেকে সিফাত বলছেন।তবে অর্থের বিষয়টি তারা আল্লাহর উপর ছেড়ে দিচ্ছেন। আর দ্বিতীয় দল সিফাতও বলছেন না। নাকচও করছেন না। বরং পুরো বিষয়টিকেই আল্লাহর উপর ছেড়ে দিচ্ছেন। তিনিই ভালো জানেন।

এখানে আরেকদল আছেন। যারা শব্দের সরল অর্থ (অংশ বা অঙ্গ) বাদ দেয়ার পর, শব্দকে পুরোপুরি অর্থহীন বলতে নারাজ। তারা বলেন, কুরআন সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। বাহ্যিক অর্থ যেহেতু নেয়া সম্ভব হচ্ছে না, সুতরাং আরবী ভাষার নিয়ম মেনে এ শব্দের সবচেয়ে উপযোগী রুপক অর্থটি নিতে হবে। পরিভাষায় যাকে, তা'বীল মায়াত তানজীহ বলে।

তাদের বক্তব্য হল,মূল শব্দের সরল বা বাহ্যিক অর্থ (অংশ বা অঙ্গ) নেয়াটা অসম্ভব হলেও পুরো বাক্যের ব্যবহার থেকে একটি সুস্পষ্ট মর্ম বোঝা যায়।আনুষঙ্গিক মর্ম থেকে বক্তার মূল উদ্দেশ্য বোঝা গেলেই যথেষ্ট।

যেমন কুরআনে এসেছে, নিশ্চয় তোমাদেরকে আল্লাহর চেহারার জন্য আহার করাচ্ছি।

এখানে চেহারা শব্দটি সরল বা বাহ্যিক অর্থ (অংশ বা অঙ্গ) নেয়া সম্ভব নয়। বরং এটি সবার মতে কুফুরী। সুতরাং আল্লাহর চেহারা দ্বারা বাহ্যিক চেহারা উদ্দেশ্য নেয়া যাচ্ছে না। তবে আনুষঙ্গিক বক্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে, এখানে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আহার করান হচ্ছে। সুতরাং এখানে চেহারা দ্বারা সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য। এটাই মূলত: তা'বীল মায়াত তানজীহ।

এখন প্রশ্ন হল, আক্বিদায় তো মতবিরোধ হওয়ার কথা না, তাহলে এই মতবিরোধে কে সঠিক?

উত্তর: এখানে অকাট্যভাবে ঐকমত্যের বিষয় আছে। সেটি হল, এসব শব্দের সরল বা বাহ্যিক অর্থে বিশ্বাস করা কুফুরী। এ বিষয়ে উপরের তিনটি দলই একমত। এবং এই ঐকমত্যের বিষয়টিই আহলে সুন্নতের আক্বিদার মূল।

সরল অর্থ বাদ দেয়ার পর শুধু শব্দকে আল্লাহর সিফাত বলা বা কোন কিছু না বলে পুরো বিষয়কে আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়া অথবা আরবী সাহিত্য ও অলংকারের নিয়ম মেনে আনুষঙ্গিক বক্তব্য থেকে রুপক অর্থ নেয়া, সবগুলোই আহলে সুন্নতের নিকট গ্রহণযোগ্য। কোনটাই বাতিল না। সালাফ থেকে উপরের সবগুলিই পাওয়া যায়। একেকজন তাদের বুঝ ও গবেষণা অনুযায়ী একেকটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

প্রশ্ন: তথাকথিত সালাফীদের সাথে পার্থক্য কোথায়?

সালাফীরা এখানে শব্দকে তার বাহ্যিক বা সরল অর্থে বিশ্বাস করতে বলে। যা আহলে সুন্নতের মতে, সুস্পস্ট বাতিল।

তাদেরকে যদি বলা হয়, হাতের বাহ্যিক অর্থ তো অংশ বা অঙ্গ। দেহের অংশ বা অঙ্গের অর্থ ছাড়া হাতের আর তো কোন সরল অর্থ বা উদ্দেশ্য নেই। তখন তারা বলে, না না। আমরা তো অংশ বা অঙ্গের অর্থে বিশ্বাস করি না।

তাহলে হাতের সরল বা বাহ্যিক অর্থটা কী? তখন আর বলতে পারে না।

এজন্য মতবাদ হিসেবে, তথাকথিত সালাফীদের মূলনীতিটা দেহবাদী কুফুরী মূলনীতি। এদের কিছু কিছু আলিম হয়ত অংশ বা অঙ্গে বিশ্বাস করে না, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অংশ বা অঙ্গে বিশ্বাস করার কারণে দেহবাদী আক্বিদা রাখে। এজন্য মূলনীতির দিক থেকে সালাফীরা আহলে সুন্নত বহির্ভূত বাতিল আক্বিদার জামাত। তবে এদের মধ্যে যারা আল্লাহর অঙ্গ বা অংশে বিশ্বাস করে না এবং বাহ্যিক বা সরল অর্থ নেয়ার দাওয়াত দেয় না, এদেরকে ভ্রষ্ট না বললেও যারা সাধারণ মানুষকে বাহ্যিক বা সরল অর্থে বিশ্বাস করতে বলে এরা ভ্রষ্ট।

মোটকথা, মূলনীতির দিক থেকে সালাফী মতবাদ আহলে সুন্নত বহির্ভূত।মূলনীতিটা দেহবাদী আক্বিদার অনুরূপ।

নজদি আলিমদের অপতৎপরতা

আক্বিদার আলোচনাগুলো অনেকেই গৌণ মনে করে আসছেন। যার ফলাফলের সামান্য চিত্র দেখেছেন। প্রকৃত অবস্থা খুবই ভয়াবহ।

আক্বিদা শুদ্ধির এই মেহনতকে আরও শক্তিশালী করা, পাশে দাঁড়ান প্রত্যেকের দায়িত্ব। নিজে সঠিক আক্বিদা শিখতে হবে। সেটা প্রচার করতে হবে। আলিম ও যোগ্য হলে বাতিলের খন্ডনও করতে হবে।

ইমাম আজম আবু হানিফা রহ: নামে নজদী-সালাফীরা একটা নিয়মিত মিথ্যাচার করে থাকে। তারা বলে, ইমাম আবু হানিফা রহ: বলেছেন,

"আল্লাহ হাত আছে, তার ধরণ আমরা আমরা জানি না"

এটা ইমাম আবু হানিফা রহ: এর নামে একটা ডাহা মিথ্যা কথা।
ইমাম আবু হানিফা রহ: এর সঠিক আক্বিদা হল,

১। পবিত্র কুরআনে আল্লাহর দিকে ইয়াদ, ওয়াজহ ইত্যাদি শব্দ সম্পৃক্ত করা হয়েছে, এগুলো তার সিফাত বা গুণ।

২। এগুলোর কোন কাইফ বা ধরণ নেই।

৩। এগুলো সরল বা বাহ্যিক অর্থ তথা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অর্থে নয়।

৪। এগুলোর বাহ্যিক অর্থ (অঙ্গ বা অংশ) বাদ দেয়ার পর এগুলোর আর কোন অর্থ আমাদের জানা নেই। এর অর্থ আল্লাহ ভালো জানেন। বাহ্যিক অর্থ বাদ দেয়ার পর নতুন কোন অর্থ আমরা নিজেদের থেকে সাব্যস্তও করব না। যেমনটি মু'তাজিলা ও ক্বাদেরিয়ারা করে থাকে। বরং বাহ্যিক অর্থকে নাকচ করলেই আমাদের দায়িত্ব শেষ। নতুন অর্থ নির্ধারণ করা বা নির্দিষ্ট করে দেয়াটা মূল সিফাতকে বাতিল করে দিতে পারে। এজন্য এগুলোর বাহ্যিক অর্থে যেমন বিশ্বাস করি না, এ দাবীও করি না যে, এগুলো রুপক। আবার এগুলোর অর্থ আমরা জানি, সে দাবীও করি না।

৫। আরবী ছাড়া অন্য কোন ভাষা যেমন ফারসীতে এগুলো অনুবাদ করাও জায়েজ নয়।

উপরের আক্বিদাকে বিকৃত করে সালাফীরা যা বানিয়েছে,

১। বাংলায় 'ইয়াদ' নামক সিফাতকে সরল অর্থে 'হাত' অনুবাদ করেছে। যা ইমাম আবু হানিফা রহ: এর আক্বিদার নামে সুস্পষ্ট মিথ্যাচার।

২। ইয়াদের সরল অর্থে বিশ্বাস করতে বলেছে। অথচ ইয়াদের সরল অর্থ দেহের অংশ বা অঙ্গ। যা স্পষ্ট ভাষায় ইমাম আবু হানিফা রহ: নাকচ করেছে। আল্লাহর জন্য এভাবে সরল অর্থে বিশ্বাস করা সুস্পষ্ট কুফুরী ও দেহবাদ।

৩। ইমাম আবু হানিফা রহ: আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় অনুবাদ করাকে না জায়েজ বলেছেন, অথচ এরা অনুবাদ করে এবং বাস্তবেই হাত উদ্দেশ্য নেয়। যা আবু হানিফা রহ: এর আক্বিদা বিরোধী।

৪। এরা সিফাত বা গুণের ধরণ সাব্যস্ত করে। এরপর বলে, ধরণ আমরা জানি না। ইমাম আবু হানিফা রহ: এর আক্বিদা হল, আল্লাহর গুণের কোন কাইফ বা ধরণ নেই। এখানেও ইমাম আবু হানিফা রহ: এর নামে মিথ্যাচার করেছে।

৫। ইমাম আবু হানিফ রহ: স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন,এসব সিফাতের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য আমরা জানি না। অথচ ইমাম আবু হানিফা রহ: এর নামে এরা সহজ-সরল বাংলা অনুবাদ চালিয়ে দিয়ে জঘন্য মিথ্যাচার করে যাচ্ছে।

এই ডাহা মিথ্যাচারের কাজে নজদী ধারার মোটামুটি সব আলিমই জড়িত আছে। মরহুম ডক্টর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ, মুফতী কাজী কাজী ইব্রাহীম থেকে শুরু করে মোটামুটি সবাই এই বিকৃতিতে জড়িত। এদের বিস্তারিত দলিল ভিত্তিক খন্ডন লিখছি ইনশা আল্লাহ। শীঘ্রই বিষয়গুলো দলিলসহ সামনে আসবে।

আইম্মায়ে মাযহাবের ব্যাপারে ড. সাহেবের বিকৃত উপস্থাপনা:শেষ পর্ব

মূল শিরোনাম:চার ইমামের নামে ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবের ভ্রান্ত আক্বিদা প্রচার (পর্ব-৪)

ইমাম আজম আবু হানিফা রহ: নামে নজদী-সালাফীরা একটা নিয়মিত মিথ্যাচার করে থাকে। তারা বলে, **ইমাম আবু হানিফা রহ: নাকি বলেছেন,"আল্লাহ হাত আছে, তার ধরণ আমরা জানি না"**

এটা ইমাম আবু হানিফা রহ: এর নামে একটা ডাহা মিথ্যা কথা।

ইমাম আবু হানিফা রহ: এর সঠিক আক্বিদা হল,

১। পবিত্র কুরআনে আল্লাহর দিকে ইয়াদ, ওয়াজহ ইত্যাদি শব্দ সম্পৃক্ত করা হয়েছে, এগুলো তার সিফাত বা গুণ।

২। এগুলোর কোন কাইফ বা ধরণ নেই।

৩। এগুলো সরল বা বাহ্যিক অর্থ তথা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অর্থে নয়।

৪। এগুলোর বাহ্যিক অর্থ (অঙ্গ বা অংশ) বাদ দেয়ার পর এগুলোর আর কোন অর্থ আমাদের জানা নেই। এর অর্থ আল্লাহ ভালো জানেন। বাহ্যিক অর্থ বাদ দেয়ার পর নতুন কোন অর্থ আমরা নিজেদের থেকে সাব্যস্তও করব না। যেমনটি মু'তাজিলা ও ক্বাদেরিয়ারা করে থাকে। বরং বাহ্যিক অর্থকে নাকচ করলেই আমাদের দায়িত্ব শেষ। নতুন অর্থ নির্ধারণ করা বা নির্দিষ্ট করে দেয়াটা মূল সিফাতকে বাতিল করে দিতে পারে। এজন্য এগুলোর বাহ্যিক অর্থে যেমন বিশ্বাস করি না, এ দাবীও করি না যে, এগুলো রুপক। আবার এগুলোর অর্থ আমরা জানি, সে দাবীও করি না।

৫। আরবী ছাড়া অন্য কোন ভাষা যেমন ফারসীতে এগুলো অনুবাদ করাও জায়েজ নয়।
উপরের আক্বিদাকে বিকৃত করে সালাফীরা যা বানিয়েছে,

১। বাংলায় 'ইয়াদ' নামক সিফাতকে সরল অর্থে 'হাত' অনুবাদ করেছে। যা ইমাম আবু হানিফা রহ: এর আক্বিদার নামে সুস্পষ্ট মিথ্যাচার।

২। ইয়াদের সরল অর্থে বিশ্বাস করতে বলেছে। অথচ ইয়াদের সরল অর্থ দেহের অংশ বা অঙ্গ। যা স্পষ্ট ভাষায় ইমাম আবু হানিফা রহ: নাকচ করেছে। আল্লাহর জন্য এভাবে সরল অর্থে বিশ্বাস করা সুস্পষ্ট কুফুরী ও দেহবাদ।

৩। ইমাম আবু হানিফা রহ: আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় অনুবাদ করাকে না জায়েজ বলেছেন, অথচ এরা অনুবাদ করে এবং বাস্তবেই হাত উদ্দেশ্য নেয়। যা আবু হানিফা রহ: এর আক্বিদা বিরোধী।

৪। এরা সিফাত বা গুণের ধরণ সাব্যস্ত করে। এরপর বলে, ধরণ আমরা জানি না। ইমাম আবু হানিফা রহ: এর আক্বিদা হল, আল্লাহর গুণের কোন কাইফ বা ধরণ নেই। এখানেও ইমাম আবু হানিফা রহ: এর নামে মিথ্যাচার করেছে।

৫। ইমাম আবু হানিফা রহ: স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, এসব সিফাতের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য আমরা জানি না। অথচ ইমাম আবু হানিফা রহ: এর নামে এরা সহজ-সরল বাংলা অনুবাদ চালিয়ে দিয়ে জঘন্য মিথ্যাচার করে যাচ্ছে।

এই ডাহা মিথ্যাচারের কাজে নজদী ধারার মোটামুটি সব আলিমই জড়িত আছে। মরহুম ডক্টর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ, মুফতী কাজী কাজী ইব্রাহীম থেকে শুরু করে মোটামুটি সবাই এই বিকৃতিতে জড়িত।

মরহুম ডক্টর খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ: তার আল-ফিকহুল আকবর সহ আক্বিদা বিষয়ক সমস্ত আলোচনার ভিত্তি বানিয়েছেন, ওহীর সরল অর্থের উপর বিশ্বাস। সরল অর্থে বিশ্বাস না করাকে তিনি ওহীর বিকৃতি, জাহমি-মুতাজেলীদের কাজ হিসেবে বার বার উল্লেখ করেছে। অথচ তার এমতটি ইমাম আবু হানিফা রহ: এর বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। এমনকি ইমাম আবু হানিফা রহ: এর কিতাবের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের নামে সম্পূর্ণ তার আক্বিদা বিরোধী বিষয়কে ইমাম আজমের আকীদা হিসেবে চালিয়ে দেয়াটাও মারাত্মক অন্যায়।

আমরা উপরে ইমাম আবু হানিফা রহ: এর যে আক্বিদাগুলো উল্লেখ করেছি, সবগুলো আক্বিদাই ইমাম আবু হানিফা রহ: এর কিতাবে রয়েছে। আমরা নিচে তার কিতাব থেকে বিষয়গুলো উল্লেখ করছি।

১। আল্লাহ তায়ালা অঙ্গ-প্রতঙ্গ থেকে মুক্ত
অথচ যেসমস্ত শব্দ সরল অর্থ দেহের অংশ বা অঙ্গ বোঝায় ইমাম আবু হানিফা রহ: সেগুলোর ক্ষেত্রে স্পষ্ট ভাষায় অঙ্গ-প্রতঙ্গের অর্থটি নাকচ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা রহ: লিখেছেন,

يدالله فوق أيديهم و ليست كأيدي خلقه و ليست بجارحة

অর্থ: কুরআনে এসেছে, ‘আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর’, আল্লাহর হাত তার সৃষ্টির হাতের মতো নয়। আল্লাহর হাত কোন অঙ্গ নয়।
[ইমাম আবু হানীফা, আল-ফিকহুল আবসাত, পৃঃ ৫৭]

আরবীতে একেবারে স্পষ্ট শব্দে **‘জারিহা’ বা অঙ্গকে নাকচ করেছেন।** অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা সব ধরণের অঙ্গ-প্রতঙ্গ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আর আল্লাহর ক্ষেত্রে ‘ইয়াদ’ (হাত) শব্দটি কখনও অঙ্গ-প্রতঙ্গের অর্থে প্রযোজ্য নয়।

২। আল্লাহর সিফাতের কোন কাইফ বা ধরণ নেই
মরহুম ডক্টর খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেবসহ অন্যান্য নজদী-সালাফীদের আক্বিদাগত আরেকটি বড় বিচ্যুতি হল, তারা আল্লাহর সিফাতের ধরণ বা কাইফ সাব্যস্ত করে। তারা বলে, এগুলোর ধরণ আছে কিন্তু তা আমাদের অজানা। এভাবে তারা সিফাতের কাইফ আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করে।

এর বিপরীতে ইমাম আবু হানিফা রহ: সহ প্রায় সমস্ত সালাফ আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে কাইফ বা ধরণকে নাকচ করেছেন।

ইমাম আবু হানিফা রহ: বলেছেন,

ولكن يده صفته بلا كيف

অর্থাৎ 'ইয়াদ' আল্লাহর সিফাত বা গুণ। এর কোন কাইফ বা ধরণ নেই।
[আল-ফিকহুল আকবর]

একইভাবে তিনি অন্যান্য সিফাতের ক্ষেত্রেও কাইফ নাকচ করেছেন।

৩। অন্য ভাষায় অনুবাদ নয়

ইমাম আবু হানিফা রহ: সহ আহলে সুন্নতের বড় একদল আলিমের অভিমত হল, যেসব সিফাত সরল বা বাহ্যিক অর্থে দেহের অংশ বা অঙ্গ বোঝায়, সেগুলোকে আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় অনুবাদ করা যাবে না। কারণ, আরবীতে 'ইয়াদ' শব্দটি আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। অন্য ভাষার শব্দটি আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা হয়নি।

আর অর্থের দিকে বিবেচনা করলে 'ইয়াদ' এর সরল অর্থ 'হাত' আল্লাহর জন্য প্রযোজন্য নয়। কারণ, হাত বলতে অঙ্গ বোঝা যায়। আর আল্লাহ তায়ালা অঙ্গ থেকে মুক্ত।
ইমাম আবু হানিফা রহ: আল-ফিকহুল আকবারে বলেছেন,

وكلُّ ما ذكرَهُ العلماءُ بالفارسيَةِ منْ صفاتِ اللهِ تعالى عزتْ أسماؤُهُ وتعالتْ صفاتُهُ فجائزٌ القولُ بهِ، سوَى اليدِ بالفارِسيِّةِ، ويجوزُ أنْ يقالَ (بُرُوْى خُدَا) بلا تشبيهٍ ولا كيفية

অর্থাৎ **ফারসী ভাষায় আলিমগণ আল্লাহর যেসব গুণের কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলো ফারসীতে বলা জায়েজ। তবে 'ইয়াদ' (হাত) শব্দটি ফারসীতে বলা যাবে না। তবে 'বুরুয়ে খোদা' (আল্লাহর চেহারার শপথ) শব্দটি বলা যাবে। তবে সকল ক্ষেত্রেই এগুলোর কোন সাদৃশ্য নেই, কোন কাইফ বা ধরণ নেই।**

উল্লেখ্য, **আল-ফিকহুল আকবারে**র প্রচলিত নুসখাগুলোতে বক্তব্যটি এভাবে আছে। তবে কিছু কিছু নুসখায় হাতের সাথে চেহারা ও চোখের কথা আছে। অর্থাৎ এগুলোও আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় অনুবাদ করা যাবে না। নুসখার এই পার্থক্যটা এখানে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কেউ কেউ ইমাম আবু হানিফা রহ: এর বক্তব্যটিকে শুধু 'হাত' এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করেছেন। কিন্তু নুসখার পার্থক্য থেকে বোঝা যায়, বাস্তবে তিনি অংশ বা অঙ্গ বোঝায় এমন সকল শব্দের ক্ষেত্রেই এমনটি বলেছেন। শুধু ফার্সী ভাষার 'বুরুই খোদা শব্দটিকে আলাদা বলেছেন। কারণ এ শব্দ থেকে সরাসরি চেহারা উদ্দেশ্য নেয়া হয় না। প্রচলিত অর্থে এটি কসমের জন্য বেশি ব্যবহৃত হয়।

নুসখার পার্থক্য ও ইমাম আবু হানিফা রহ: এর বক্তব্যের সঠিক উদ্দেশ্য নিয়ে বিস্তারিত একটি লেখা তৈরির নিয়ত রয়েছে ইনশা আল্লাহ।

নুসখার পার্থক্যের বিষয়টি উল্লেখ না করলেও এখানে ইমাম আবু হানিফা রহ: এর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, তিনি হাতের সরল অর্থ উদ্দেশ্য নিতেন না এবং অনুবাদের ক্ষেত্রে যেহেতু সরল অর্থটাই অনুবাদ হবে, এজন্য তিনি অনুবাদ করাকেও নাজায়েজ মনে করতেন। এছাড়া আমরা প্রথম বক্তব্যে দেখেছি, ইমাম আবু হানিফা রহ: হাতের ক্ষেতের স্পষ্ট ভাষা অঙ্গের অর্থটি নাকচ করেছেন।

মোটকথা, সকল দলিল এখানে মরহুমের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। মরহুম এসব সিফাতের ক্ষেত্রে সরল অর্থ নেয়ার যেই মূলনীতি দিয়েছেন, এটা ইমাম আবু হানিফা রহ: এর আক্বিদার সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক।

৪। অন্য কোন অর্থ নির্ধারণ নয়

দেহের অংশ বা অঙ্গ বোঝায়, এজাতীয় শব্দের সরল বা বাহ্যিক অর্থ বাদ দেয়ার পর আমাদের কাছে

১। মূল শব্দ যার বাহ্যিক সরল অর্থ বাদ দেয়া হয়েছে।

২। তার কিছু রুপক অর্থ থাকে।

রুপক অর্থসমূহের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা রহ: এসব শব্দ থেকে যে কোন রুপক অর্থকে নির্ধারণ করতে নিষেধ করেছেন। কারণ, অনেকগুলো রুপক অর্থ থেকে কোনটি উদ্দেশ্য সেটি সুনিশ্চিত নয়। আবার কোন একটা অর্থ নির্ধারণ করে দিলে মূল সিফাতটি বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এজাতীয় সম্ভাবনা থেকে মুক্ত থাকার জন্য তিনি সুনিশ্চিতভাবে অর্থ নির্ধারণ করতে নিষেধ করেছেন। মু'তাজিলা ও ক্বাদেরিয়ারা একাজটি করতো।

এখন প্রশ্ন আসে তাহলে এখানে 'ইয়াদ' শব্দকে কী করা হবে?

মূল শব্দটি যেহেতু আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, এজন্য ইমাম আবু হানিফা রহ: বলেন, শুধু শব্দকে আমরা সিফাত বলব। তবে এর অর্থ আমরা জানি না। অর্থ আল্লাহ তায়ালা ভালো জানেন।

তাহলে মৌলিকভাবে কয়েকটি বিষয় আমাদের সামনে এসেছে,

১। মূল 'ইয়াদ' শব্দ। যা আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, এই শব্দগুলোকে সিফাত বলা যাবে।

২। এর বাহ্যিক বা সরল অর্থ তথা অঙ্গ উদ্দেশ্য নয়।

৩। এর রুপক অর্থসমূহের কোনটি সুনির্দিষ্ট করা যাবে না। অর্থাৎ হাত বলে শক্তিকে নির্দিষ্ট করা যাবে না।

৪। অন্য কোন ভাষায় বাহ্যিক বা সরল অর্থে অনুবাদ করা যাবে না।

এ বিষয়ে **ইমাম আবু হানিফা রহ: বলেন,**

وله يد ووجه ونفس فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف ولا يقال إن يده قدرته او نعمته لأن فيه إبطال الصفة وهو قول أهل القدر والاعتزال ولكن يده صفته بلا كيف وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف

আল্লাহ তাআলার ইয়াদ (হাত), ওয়াজহ (চেহারা) ও নফস রয়েছে। আল্লাহ তাআলা কোরআনে ইয়াদ(হাত), ওয়াজহ(চেহারা) ও নফস সম্পর্কে যা ই উল্লেখ করেছেন, সেগুলো তাঁর গুণ।এর কোন কাইফ নেই।

এখানে একথা বলা যাবে না যে, তাঁর হাত দ্বারা তাঁর কুদরত বা নেয়ামত উদ্দেশ্য।কেননা এতে করে আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে অস্বীকার করা হয়।যা মূলত কাদেরিয়্যা ও মুতাযিলাদের মত। বরং আল্লাহ্‌র ইয়াদ(হাত) তাঁর একটি গুন। এবং আল্লাহ্‌র রাগ ও সন্তুষ্টিও তাঁর গুণাবলির মধ্য থেকে দুটি গুন। এগুলোরও কোন কাইফ নেই।
[আল-ফিকহুল আকবর]

৫। সিফাতের অর্থ অজানা

ইমাম আবু হানিফা রহ: আরশে 'ইস্তিওয়া' সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এখানে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, আমরা পবিত্র কুরআনের ইস্তিওয়ার উপর ঈমান রাখি। কিন্তু ইস্তিওয়া দ্বারা সরল অর্থে কী উদ্দেশ্য সেটা আমাদের অজানা। আমরা এর অর্থ জানার দাবী করি না।

ইমাম আবু হানিফা রহ: এর বক্তব্য সংকলন করেছেন ইমাম সায়েদ নিশাপুরী রহ:, তিনি উল্লেখ করেছেন,

حكي عن أبي حنيفة في رسالته إلى مقاتل بن سليمان جواب كتابه، في فصل منها: وأما قوله تعالى على العرش استوى حقا، فإنّما ننتهي من ذلك إلى ما وصف كتابُ ربنا في قوله تعالى (ثم استوى على العرش)، وتَعْلَمَنَّ أنه كما قال، ولا ندعي في استوائه على العرش علما، ونزعم أنه قد استوى، ولا يشبه استواؤه باستواء الخلق، فهذا قولنا في الاستواء على العرش.

''ইমাম আবূ হানীফা থেকে বর্ণিত, তিনি মুকাতিল ইবন সুলাইমান (১৫০ হি)-এর পত্রের উত্তরে লেখা তাঁর পত্রের একটি অনুচ্ছেদে লিখেন: 'মহান আল্লাহ বলেছেন: তিনি আরশের উপর ইসিতওয়া করেছেন। সত্যই তিনি তা করেছেন। **আমাদের রবের কিতাব এ বিষয়ে যা বর্ণনা করেছেন সেখানেই আমরা থেমে যাই। আল্লাহ বলেছেন: 'অতঃপর তিনি আরশের উপর ইস্তিওয়া করলেন।'** আপনি নিশ্চিত জানুন যে, তিনি যা বলেছেন বিষয়টি তা-ই। আমরা তাঁর ইস্তিওয়ার বিষয়ে কোনো 'জ্ঞানের' দাবি করি না। আমরা মনে করি তিনি ইস্তিওয়া করেছেন এবং তাঁর ইস্তিওয়া সৃষ্টির ইস্তিওয়ার অনুরূপ বা তুলনীয় নয়। আরশের উপর ইস্তিওয়া বিষয়ে এটিই আমাদের বক্তব্য।''

সায়িদ নাইসাপূরী, আল-ই'তিকাদ, পৃ ১৪৯।

এখানে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল, ইমাম আবু হানিফা রহ: স্পষ্ট শব্দে বলেছেন আমরা 'ইস্তিওয়া' শব্দকে যখন আল্লাহর গুণ বিশ্বাস করি, তখন এর অর্থ জানার দাবী করি না। তিনি লিখেছেন,

ولا ندعي في استوائه على العرش علما

অর্থাৎ **আল্লাহর 'ইস্তিওয়া' বিষয়ে আমরা কোন ইলমের দাবী করি না।**

অর্থাৎ আল্লাহর ইস্তিওয়ার সরল বা বাহ্যিক উদ্দেশ্য আমাদের অজানা। বাহ্যিকভাবে আমরা ইস্তিওয়া বলতে যা বুঝি সেটি আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য নয়। বাহ্যিক অর্থকে নাকচ করার পর কী উদ্দেশ্য সেটি জানার দাবী আমরা করি না।

বাহ্যিক অর্থ নাকচ করার পর এগুলো দ্বারা কী উদ্দেশ্য সেটি না জানার বিষয়ে অসংখ্য ইমামের বক্তব্য রয়েছে। এ বিষয়ে শুধু ইমাম আবু হানিফা রহ: বলেছেন, বিষয়টি এমন নয়। বরং সালাফ থেকে 'লা মা'না ওলা কাইফা' (কোন অর্থ নেই, কোন কাইফ নেই), এজাতীয় শব্দ খুবই প্রসিদ্ধ। অসংখ্য ইমাম থেকে এটি বর্ণিত হয়েছে।

উদাহরণ স্বরুপ ইমাম ইবনে সুরাইজ রহ (২৪৯-৩০৬ হি:) বলেন,

ان السوال عن معانيها بدعة و الجواب كفر و زندقة

অর্থ: এসবের অর্থ জিজ্ঞেস করা বিদয়াত। আর এর উত্তর হল, কুফুরী ও ধর্মদ্রোহিতা।
(আল-উলু, ইমাম যাহাবি রহ, পৃ:২০৭)

ইমাম ইবনে সুরাইজ রহ: এসবের অর্থ করা বা অনুবাদ করার বিরোধী ছিলেন। তারা যদি এগুলোর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করতেন তাহলে কখনও এসম্পর্কে প্রশ্ন করাকে বিদয়াত বলতেন না। আর এর উত্তর প্রদানকে কুফুরী ও ধর্মদ্রোহিতা বলতেন না। এজাতীয় প্রশ্নের উত্তরকে কুফুরী বলার কারণ হল, এসব আয়াত বা হাদীসের বাহ্যিক অর্থ আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা কুফুরী। নুজুল দ্বারা উপর থেকে নীচে নামা উদ্দেশ্য, হাত দ্বারা অঙ্গ উদ্দেশ্য নিলে কুফুরী হবে। এসব আয়াত বা হাদীসের বাহ্যিক অর্থ আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য নয়। এগুলো আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করলে কুফুরী হবে। এজন্য ইমাম ইবনে সুরাইজ রহ: এ সংক্রান্ত উত্তরকে কুফুরী ও ধর্মদ্রোহিতা আখ্যা দিয়েছেন। ইবনে সুরাইজ রহ: এসব শব্দকে অন্য ভাষায় অনুবাদেরও বিরোধী ছিলেন। এজাতীয় অসংখ্য বর্ণনা উল্লেখ করা যাবে, যেখানে সালাফ বাহ্যিক অর্থকে নাকচ করেছেন। এর **বিপরীতে তাইমী মাজহাবের অনুসরণে মরহুম আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ: সরল বা বাহ্যিক অর্থ নেয়ার মতবাদ প্রচার করেছেন।** যা ইমাম আবু হানিফা রহ: এর উপর্যুক্ত মৌলিক আক্বিদার সম্পূর্ণ বিরোধী।

উদাহরণস্বরুপ ইমাম আবু হানিফা রহ: ইস্তিওয়া শব্দের ব্যাপারে বলেছেন, এর উপর আমরা ঈমান রাখি| অতিরিক্ত কোন জ্ঞানের দাবী করি না| অথচ মরহুম এখানে ইস্তিওয়া শব্দের সরল অর্থে বিশ্বাস করতে বলেছেন|
মরহুমের কাছে জিজ্ঞাসা থেকে যায়, ইস্তিওয়ার সরল অর্থটা কী?
তিনি অর্থ করেছেন,

“মহান আল্লাহর আরেকটি বিশেষণ আরশের উপর অধিষ্ঠান| কুরআনে সাত স্থানে বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ আরশের উপর ‘ইসতিওয়া’ করেছেন|[1] আরবীতে কোনো কিছুর উপর ‘ইসতিওয়া’ অর্থ তার উর্ধ্বে অবস্থান (rise over, mount, settle)| সালাতের নিষিদ্ধ সময় বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একজন প্রশ্নকারীকে বলেন:

حَتَّى تَسْتَوِىَ الشَّمْسُ عَلَى رَأْسِكَ كَالرُّمْحِ ، فَإِذَا اسْتَوَتْ عَلَى رَأْسِكَ كَالرُّمْحِ فَدَعِ الصَّلاَةَ

‘‘(সালাত বৈধ থাকবে) যতক্ষণ না সূর্য তোমার মাথার উপরে তীরের মত ইসতিওয়া (উর্ধ্বে অবস্থান) করবে| যখন সূর্য তোমার মাথার উপর তীরের মত ইসতিওয়া (উর্ধ্বে অবস্থান) করবে তখন সালাত পরিত্যাগ করবে|’’ আমরা এ বইয়ে ‘ইসতিওয়া’-র অনুবাদে উপরে অবস্থান বা অধিষ্ঠান শব্দ ব্যবহার করব, ইনশা আল্লাহ|”

মরহুমের নিকট উপরে অবস্থান অর্থে অধিষ্ঠান শব্দটি ইস্তিওয়ার সরল অর্থ| সত্য কথা হল, অধিষ্ঠান শব্দটিও সরল নয়| প্রথম শুনে এর অর্থ নির্ধারণ করাও কঠিন| অভিধান ঘেটে যা পেলাম,
“অধিষ্ঠান/বিশেষ্য পদ/অবস্থিতি; উপবেশন; উপস্থিতি; আবির্ভাব মূর্তিতে দেবতার-. বাসস্থান; আশ্রয়, অবস্থিতি, ক্ষেত্র মনোবিদ্যায়. স্বভাবগত হওন|”

তিনি এখান থেকে উপরে অবস্থান অর্থ নিয়েছেন| অথচ আমরা অন্যান্য সালাফীদেরকে দেখি তারা সমাসীন অর্থ করে| আরেক সালাফী শায়খ আরশে ওঠার অর্থ করে বই লিখেছেন, রহমান আরশে ওঠেছেন|
এগুলোর মধ্যে বাস্তবে কোনটা সরল অর্থ সেটা কীভাবে নির্ধারিত হল? আর এগুলো কি আদৌ আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য? ইমাম আবু হানিফা রহ: যেখানে বলছেন, আমরা আরশে ইস্তিওয়ার উপর ঈমান রাখি কিন্তু এ বিষয়ে কোন জ্ঞানের দাবী করি না, সেখানে ইমাম আবু হানিফা রহ: এর আক্বিদা ব্যাখ্যার নামে কীভাবে জ্ঞানের দাবী করে আল্লাহর জন্য অধিষ্ঠান নির্ধারণ করা হল? আরও অবাক করার বিষয় হল, সাইদ নাইসাপুরীর উপরের বর্ণনাটি তিনি তার বইয়ে এনেছেন| কিন্তু এ বর্ণনার মূল বক্তব্য তিনি গ্রহণ করেননি|

রহমান আরশে ওঠার (নাউজুবিল্লাহ) মত তিনিও একটি অর্থ গ্রহণ করতেই পারেন কিন্তু সেটি ইমাম আবু হানিফা রহ: এর আক্বিদা ব্যাখ্যার নামে চালিয়ে দেয়া ঘোরতর অন্যায়| যেখানে ইমাম আবু হানিফা রহ: নিজেই অর্থ করার বিরোধী ছিলেন| তিনি কি

কোথাও বলেছেন, ইস্তিওয়ার অর্থ বা উদ্দেশ্য উপরে অবস্থান বা অধিষ্ঠান? অথবা ইস্তিওয়ার সরল ও বাহ্যিক অর্থে বিশ্বাস করতে হবে? ইমাম আবু হানিফা রহ: এর বইয়ের ব্যাখ্যার নামে তারই প্রসিদ্ধ আকিদা বিরোধী বক্তব্য চালিয়ে দেয়ার অর্থ কী?

দেহবাদের গল্প

আল্লাহ তায়ালা নাবী-রাসূলকে তাদের স্বজাতির ভাষায় প্রেরণ করেছেন। তাদের ভাষায় ওহী প্রেরণ করেছেন। পৃথিবীর এই ভাষাগুলো আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্যই বানিয়েছেন। যুগে যুগে উদ্ভব হয়েছে নতুন নতুন ভাষার।

মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনে যে ভাষা ব্যবহার করে সেগুলোর মর্ম ও উদ্দেশ্য সাধারণত: সৃষ্টির প্রয়োজন পূরণের জন্য। আবার এই ভাষার মর্মগুলোও উপলব্ধ হয় শুধু আমাদের ব্রেনে।

এখানে দু'ধরণের সীমাবদ্ধতা থাকে।

১। ভাষাগত সীমাবদ্ধতা। অর্থাৎ আমাদের ব্যবহৃত শব্দের সংখ্যা যেমন সীমিত সেই শব্দ ব্যবহার করে যেসব শব্দমালা তৈরি করা যায়, সেগুলো বেশ সীমিত।

২। আমাদের ব্রেনের সীমাবদ্ধতা। বাই ডিফল্ট ব্রেনে যে কোন কিছু কল্পনা করতে গেলে স্থান ও সময় নামক দু'টি বিষয় এসে হাজির হয়। এদু'টো ছাড়া তারা ব্রেনে কোন ইমেজ তৈরি করতে পারে না।

প্রথম সীমাবদ্ধতা থেকে বাচার জন্য মানুষ নতুন একটি কৌশল অবলম্বন করেছে। সীমিত সংখ্যক শব্দ দিয়ে মনের ভাব প্রকাশের ইচ্ছা পূরণ করতে চেয়েছে। এজন্য বেছে নিয়েছে রুপকের পথ। রুপকের পাখায় ভর করে ভাষাগত সীমাবদ্ধতা ছাপিয়ে মানুষ সাহিত্যের কল্পরাজ্যে প্রাসাদ তৈরি করা শুরু করেছে।

এভাবে সীমিত সংখ্যক শব্দ দিয়ে গড়ে ওঠেছে হাজারও কবিতা। তৈরি হয়েছে একই শব্দের নানা মাত্রিক ব্যবহার। সেখানে গড়ে ওঠেছে হাজারও অর্থের সম্ভাবনা। প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ব্যবহার যেমন বাড়ছে, সেই সাথে যোগ হচ্ছে নতুন নতুন অর্থও। ফুলের সৌন্দর্য্য, নদীর কলতান আর পাখির কুহু কুহু সবই মূর্ত হয়ে ওঠে রুপকের ঘাড়ে ভর করে।

দ্বিতীয় সীমাবদ্ধতা থেকে বের হওয়ারও রাস্তা তৈরি করে দিয়েছেন আল্লাহ তায়ালা। যেহেতু আমাদের কল্পনাশক্তি খুব সীমিত, সেখানে স্থান-কাল পূর্ব থেকেই বসে থাকে, এজন্য দিয়েছেন আক্বল। অনেক কিছু কল্পনা করা সম্ভব না হলেও আক্বল দিয়ে আমরা ঠিকই প্রমাণ করতে পারি। এভাবে সময় ও স্থানের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বে অবস্তুজগত আমাদের কাছে মূর্ত হয়ে ওঠে।

উপরের দু'টি বিষয়কে সামনে রেখেই আল্লাহ তায়ালা আমাদের কাছে দ্বীন ও শরীয়ত পাঠিয়েছেন।ওহী পাঠিয়েছেন। কিতাব পাঠিয়েছেন।

সৃষ্টি হয়েও স্রষ্টার পরিচয় পেতে চাওয়ার যেই সক্ষমতা সেটা আল্লাহ তায়ালাই আমাদেরকে দিয়েছেন। নতুবা এটি একটি ধৃষ্ঠতা ছাড়া আর কী? নশ্বর ক্ষুদ্র এক সৃষ্টি মহাবিশ্বের স্রষ্টার পরিচয় পেতে চাচ্ছে। আল্লাহ তায়ালাই বিষয়গুলো আমাদের জন্য সহজ করেছেন।

তবে মানবীয় সীমাবদ্ধতার কারণে এ পথে নানা প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। মানুষ স্বাভাবিকভাবে স্রষ্টাকে কল্পনা করতে চায়। অথচ স্রষ্টা তো কখনও তার কল্পনার মূর্তির মত নন। তার মতো তো কিছুই নেই। মানুষ স্রষ্টাকে সময় দিয়ে বেধে ফেলতে চায়। নির্দিষ্ট জায়গা ও স্থানে তাকে ভাবতে ভালোবাসে। কারণ তার সকল চিন্তা-ভাবনা জায়গা ও স্থানকে ঘিরেই। সময় ও স্থান মুক্ত কোন সত্ত্বা তার কল্পনায় আসে না। অথচ সময় ও স্থানের স্রষ্টা মহান আল্লাহ এগুলো থেকে মুক্ত। সে জেনেও কল্পনা করতে যায়। অথচ তার মনে রাখা দরকার ছিল, স্রষ্টা কল্পনার বিষয় নয়। যুক্তি ও আক্বল দিয়ে প্রমাণ ও বিশ্বাসের বিষয়। ওহীর মাধ্যমে যার পরিচয় পরিপূর্ণ হয়।

ওহীর মাধ্যমে স্রষ্টার পরিচয় পাওয়াটা বেশ সহজ বিষয় ছিল। কিন্তু এখানেও মানবীয় সীমাবদ্ধতাগুলো ঘিরে ধরে। ওহীর বক্তব্যগুলোকে চিরাচরিত নিয়মে ব্যাখ্যা করতে ও চিন্তা করতে ভালোবাসে। অথচ সব বক্তব্য এক পর্যায়ের নয়। স্রষ্টার পরিচয়ের জন্য মানবীয় সীমাবদ্ধতাগুলোকে কাটিয়ে ওঠা এখানে মূল চ্যালেঞ্জ। এরপরও মানুষ বার বার স্রষ্টাকে সৃষ্টির স্তরে নামায়। তার কল্পিত মূর্তি তৈরি করে। কেউ বাস্তব মূর্তি তৈরি করে। কেউ মানবীয় গুণাগুণ স্রষ্টার জন্য সাব্যস্ত করে বসে। কেউ দেহবাদ সাব্যস্ত করে স্রষ্টার জন্য পুত্র, কন্যা, স্ত্রী সাব্যস্ত করে। এভাবে বার বার দেখা জীবনের নিয়ম-কানুন দিয়ে স্রষ্টার বিশ্বাসকে কলুষিত করে। কুফুরী করে। শিরক করে।

এজন্য দেখা নিয়ম-কানুন, দেখা রুচিবোধের বাইরে আরেকটি রুচিবোধ প্রয়োজন। আরেকটি আক্বল প্রয়োজন। যা পরিচালিত হবে ওহী ও যুক্তির অকাট্য নিয়মে। দৈনন্দিন মানবীয় সীমাবদ্ধতা ছাপিয়ে যেখানে স্থান পাবে সাদৃশ্যমুক্ত অকাট্য বিশ্বাস।

নবী-রাসূলের সহচর্য ও ওহীর নির্মল ধারায় সরাসরি অবগাহনের সুযোগ যারা পেয়েছিলেন তারা এমন রুচিবোধ তৈরি করেছেন। এমন আক্কল তৈরি করেছেন। যেটা ছিল সাদৃশ্যমুক্ত তাউহীদের শ্রেষ্ঠ নমুনা।

যুগে যুগে এর ব্যত্যয় ঘটতে থাকে। মানুষ আবার ফিরে আসে মানবীয় পৌত্তলিকতায়। তার রুচিবোধ নস্ট হয়। ওহী বোঝার মতো সুস্থ্য আক্কল নষ্ট হয়। ফিরে আসে মূর্তিপূজা। কল্পনায়। মন্দিরে। গীর্জায়।

এই পৌত্তলিকতার বড় নিয়ামক ওহীর বুঝ ও ব্যাখ্যা। একই বক্তব্য সঠিকভাবে বুঝলে মু'মীন। ভুল বুঝলে কুফুরী-শিরক। এই বুঝ ও ব্যাখ্যায় এসে যুগে যুগে মানুষ ভ্রষ্ট হয়েছে।

নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা ওহী পাঠাননি, উজাইর আ: আল্লাহর পুত্র (নাউজুবিল্লাহ)। দেহবাদের ধারণা থেকে ওহীর বিকৃতির মাধ্যমে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করেছে।

খ্রিষ্টানরা তিন খোদা বানাল কীভাবে? ওহীকে বিকৃত করে। ওহীর বক্তব্য ও মর্মকে বিকৃত করে। নতুবা আল্লাহ তায়ালা তো তাদেরকে ত্রিত্ববাদ শেখাননি (নাউজুবিল্লাহ)। কিতাবের অনুসারী হয়েও কীভাবে ভ্রষ্টতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হলো?

একটা বড় কারণ ছিল, ওহীর বুঝ ও ব্যাখ্যা। ওহীর রুচিবোধ থেকে বের হয়ে মানবীয় সীমাবদ্ধতা ওহীর উপর প্রয়োগ। সেটাকে ওহী অনুসরণের নাম দেয়া। কোথাও ব্যাখ্যা হিসেবে। কোথাও আক্ষরিক বক্তব্য অনুসরণের নামে।

পৌত্তলিকতার রুচিবোধ নিয়ে কেউ বলতেই পারে, কুরআনে তো বহু খোদার কথা আছে। কারণ, আল্লাহর জন্য বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ নিজেই বলেছেন, আমরা। বহু খোদা না হলে তো 'আমরা' বলতেন না। সব-সময় আমি বলতেন। সুতরাং আক্ষরিক অর্থে বিশ্বাস করলে তো কুরআনে বহু খোদার কথাই আছে। নাউজুবিল্লাহ।

আরেক পৌত্তলিক হয়ত বলবে, কুরআনেই আছে আমরা স্রষ্টার অংশ। কারণ, আমাদের মধ্যে তিনি তার আত্মাকে ফুঁৎকার দিয়ে প্রবেশ করিয়েছেন। যা তোমাদের কুরআনেই আছে। সুতরাং আমরা তো সবাই স্রষ্টার আত্মা বহন করে চলছি। নাউজুবিল্লাহ।

খ্রিষ্টান এসে বলবে, ত্রিত্ববাদ প্রমাণে বাইবেলের প্রয়োজন কী? কুরআনেই তো ঈসা আ: কে স্রষ্টার আত্মা, কালিমা বলা হয়েছে।

এভাবে অক্ষরবাদই যথেষ্ট। ইসলামে তাউহীদের ধারণাকে গুড়িয়ে দিয়ে পৌত্তলিকতা ফিরিয়ে আনার। ঠিক একই পদ্ধতিতে ইহুদীরা পথভ্রষ্ট হয়েছিল। ঠিক একই পথ ধরে খ্রিষ্টানরা ত্রিত্ববাদের বেড়াজালে আটকা পড়েছে।

রাসূল স: বলেছেন, হাজওয়াল কুজ্জা বিল কুজ্জা। পদে পদে তোমরা ইহুদী-খ্রিষ্টানদেরকে অনুসরণ করবে। যেই দেহবাদী চিন্তা-চেতনা ও অক্ষরবাদের কারণে ইহুদী-খ্রিষ্টান পথভ্রষ্ট হল, সেটা কি মুসলিমদের মধ্যে থাকবে না?

কালের পরিক্রমায় ইহুদী-খ্রিষ্টানদের পদাংক অনুসরণে তাদেরই হাত ধরে ইসলামেও দেহবাদ ঢুকে গেল। মূলনীতিগুলো একই।

১। মুহকাম বা অকাট্য বিষয়গুলোকে অগ্রাহ্য করল।

২। অস্পষ্ট, সন্দেহপূর্ণ ও সম্ভাব্য বিষয়গুলোকে দ্বীনের মূল বানিয়ে নিল।

৩। পৌত্তলিক রুচিবোধ নিয়ে চরম অক্ষরবাদিতা শুরু করল।

এভাবে ছড়িয়ে পড়ল দেহবাদ। অক্ষরবাদিতা যার মূল। আক্বলী - নক্বলী (ওহী) মুহকাম (অকাট্য) বক্তব্য হয়ে গেল গৌণ। স্রষ্টার মতো কিছু নেই, এটা হয়ে গেল দুর্বোধ্য। সরল অর্থে হাত থাকাটা হয়ে গেল সুস্পষ্ট। দিন হয়ে গেল রাত। ফিরে এলো কাল্পনিক মূর্তিপূজা।

দেহবাদী কীভাবে বুঝব?

➤আল্লাহর জন্য **অংশ বা অঙ্গ সাব্যস্ত করে।**

➤আল্লাহর যে কোন গুণকে আকার—আকৃতি মনে করে। আল্লাহর সিফাতকে আকার মনে করে আল্লাহ তায়ালার আকার সাব্যস্ত করে।

➤যারা বলে আল্লাহর আকার আছে যেমন হাত, পা ইত্যাদি। **আকার বলতে তারা হাত-পা বোঝে।**

➤যারা বলে, আল্লাহর আকার না থাকলে জান্নাতে কীভাবে দেখব। এরা মূলত: দেহবাদী। আল্লাহর জন্য দেহ সাব্যস্ত করে সেই দেহের আকার - আকৃতি দেখার বিশ্বাস রাখে।

➤যারা আল্লাহর দিকে 'হাত', 'পা' ইত্যাদি সম্পৃক্ত করে এবং এগুলোর সরল অর্থে বিশ্বাস করতে বলে। অথচ আল্লাহ তায়ালা এগুলোর সরল অর্থ তথা অংশ ও অঙ্গ থেকে মুক্ত। অংশ ও অঙ্গ থেকে মুক্ত ঘোষণা করলে এগুলোর আর কোন সরল অর্থ থাকে না। এরপরও যারা সরল অর্থে বিশ্বাসের দাওয়াত দেয়, এদের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, এদের মূলনীতিটা দেহবাদী। এরপর সে যদি স্পষ্টভাবে আল্লাহ তায়ালার অংশ ও অঙ্গ নাকচ করে তাহলে তাকে দেহবাদী বলা না হলেও তার মূলনীতি দেহবাদী হওয়াই এটি খন্ডন করতে হবে।

কারণ, সে দু'টি স্ববিরোধী বিষয়কে একত্র করেছে। সরল অর্থে 'হাত' হবে আবার সেটি অংশও নয়, অঙ্গও নয়, তাহলে এটি সরল অর্থও নয়। একই সাথে দু'টো বিষয় কখনও সত্য হবে না। এখানে হয় সরল অর্থের দাবী ভুল অথবা অংশ বা অঙ্গ না হওয়ার দাবী ভুল।

সাধারণত: এরা মুখে অংশ ও অঙ্গ নাকচ করলেও অন্তরে তাদের অংশ ও অঙ্গ বিশ্বাস করে। **কারণ, তারা তাদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করে সরল অর্থে বিশ্বাসের উপর। যা সুস্পষ্ট দেহবাদ।**

মুসলিম হিসেবে পুরোপুরি দেহবাদ প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত আমরা সুধারণা হিসেবে তার সরল অর্থের দাবীকে ভুল মনে করে তাকে দেহবাদী বলব না। তবে একই সাথে স্ববিরোধী বিষয় একত্র করায় তার এই স্ববিরোধী দেহবাদী মূলনীতিকে অবশ্যই খন্ডন করতে হবে। সাধারণ মানুষ যেহেতু এসব পার্থক্য করতে পারে না, এজন্য এদের এই স্ববিরোধী বক্তব্যের কারণে তারা বিভ্রান্ত হবে। সাধারণ মানুষের কাছে তাদের এই দেহবাদী মূলনীতি প্রচারের উপর কঠোর হতে হবে। যেন তারা সাধারণ মানুষকে তাদের এই দেহবাদী মূলনীতি দিয়ে বিভ্রান্ত করতে না পারে।

এদের অপরাধ দু'টি:

১। একই সাথে 'সরল অর্থ' হওয়া এবং অংশ ও অঙ্গ না হওয়ার মতো স্ববিরোধী বিষয়কে একত্র করেছে। এধরণের স্ববিরোধিতা (তানাকুজ) এর কারণে এদের ইলমী অসারতা সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে। ইলমী তানাকুজের মতো হাস্যকর বিষয় যেন পরবর্তীতে উপস্থাপন না করতে পারে।

২। সাধারণ মানুষ পার্থক্য করতে না পারায় অধিকাংশ মানুষ দেহবাদী হচ্ছে। সাধারণ মানুষকে দেহবাদী বানাবার এই দেহবাদী কুফুরী মিশনের বিরুদ্ধে সবাইকে সতর্ক করতে হবে।

প্রশ্নোত্তরের আলোকে আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে সালফে-সালেহীনের আক্বিদা:পর্ব ১

মূল শিরোনাম :আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে সালাফে সালেহীনের আক্বিদা (১ম পর্ব)

প্রশ্ন: সিফাতে খাবারিয়্যার ক্ষেত্রে সালাফের মাজহাব কী ছিল?

উত্তর:

সালাফদের ঐকমত্যপূর্ণ মাজহাব ছিল তানজীহ। সকলেই আল্লাহ তায়ালাকে সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত বিশ্বাস করতেন। এ বিষয়ে কেউ দ্বিমত করতেন না। সুতরাং সালাফের সমস্ত বক্তব্য সামনে রাখলে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সকলের ঐকমত্যপূর্ণ মাজহাব ছিল তানজীহ।

যেমন নুজুল বা অবতরণ। **আল্লাহর নুজুল যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন নয়, এব্যাপারে সকলেই একমত। একইভাবে আল্লাহর নুজুল উপর থেকে নীচে নামান নয়।**

সালাফদের কেউ কেউ ইয়াদকে (হাত) সিফাত বলেছেন। কিন্তু তাদের সকলেই এ বিষয়ে একমত ছিলেন, ইয়াদ কোন অঙ্গ বা দেহের কোন অংশ নয়।

মোটকথা, তানজীহ (সৃষ্টির সাদৃশ্য থেকে আল্লাহ তায়ালাকে মুক্ত বিশ্বাস করা) হল সালাফের ঐকমত্যপূর্ণ মাজহাব।

প্রশ্ন: তানজীহের পর সালাফ কী করতেন?

উত্তর: এ বিষয়ে সালাফের মধ্যেই মতবিরোধ আছে। মোটামুটি তিনটি মত পাওয়া যায়।

১। ইসবাত মা'আত তানজীহ।

২। তাফয়ীজ মা'আত তানজীহ।

৩। তা'বীল মা'আত তানজীহ।

প্রশ্ন: এগুলোর ব্যাখ্যা কী?

উত্তর:

১। ইসবাত মায়াত তানজীহ হল, প্রথমে **তারা শব্দের আক্ষরিক অর্থ থেকে আল্লাহকে মুক্ত ঘোষণা করতেন। এরপর তারা ঐ শব্দকে আল্লাহর সিফাত বলতেন।** তবে শব্দের আক্ষরিক অর্থ বাদ দেয়ার পর ঐ শব্দের কী অর্থ হবে, তা আল্লাহ দিকে ন্যস্ত করতেন।

এক্ষেত্রে মূলত: তারা **<u>তা'বীল ও তাফয়ীজ</u>** করতেন। ***<u>অর্থাৎ শব্দের আক্ষরিক অর্থ বাদ দেয়া হল তা' বীল। ঐ শব্দকে আল্লাহর সিফাত সাব্যস্ত করা হল ইসবাত।ঐ শব্দের আসল অর্থ ও উদ্দেশ্য কী হবে সেটা আল্লার দিকে ন্যস্ত করা হল তাফয়ীজ।</u>***

উদাহরণ: ইয়াদ।অর্থ হল, হাত। আরবী 'ইয়াদ' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল, এটি দেহের অঙ্গ বা অংশ। সালাফদের সকলেই এই অর্থ পরিত্যাগ করেছেন। ইয়াদ ব্যবহার কতে অঙ্গ বা অংশ উদ্দেশ্য না নেয়া হল এক ধরণের তা'বীল।এরপর কেউ কেউ ইয়াদকে সিফাত বলেছেন। এটা হল ইসবাত (সিফাত সাব্যস্তকরণ)।

ইয়াদের বাহ্যিক অর্থ (অঙ্গ) পরিত্যাগ করার পর ইয়াদ দ্বারা আসলে কী উদ্দেশ্য সেটা আল্লাহ জানেন। এভাবে **<u>ইয়াদের আসল উদ্দেশ্য আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়াকে বলে তাফয়ীজ।</u>** একই সাথে তা'বীল, ইসবাত ও তাফয়ীজ পাওয়া গেল। এটা কিছু কিছু সালাফের মত ছিল।

২। তাফয়ীজ মা'আত তানজীহ হল, শব্দের আক্ষরিক অর্থ বাদ দেয়ার পর কী অর্থ হবে সেটা আল্লাহর উপর ন্যস্ত করা। এক্ষেত্রে **আক্ষরিক অর্থ বাদ দেয়ার পর অন্য কোন অর্থ তারা নির্ধারণ করতেন না। আবার এটাও বলতেন না যে, এটা আল্লাহর সিফাত।**

যেমন, আরবীতে ইয়াদ এর প্রায় পঁচিশটা অর্থ রয়েছে। *ফাতহুল বারীতে ইবনে হাজার আসকালানী রহ: ইয়াদ এর পঁচিশটা অর্থ লিখেছেন*। ইয়াদের আক্ষরিক অর্থ বাদ দেয়ার পর এই পঁচিশটার কোনটা উদ্দেশ্য অথবা অন্য কোন অর্থ উদ্দেশ্য কি না, সেটা তারা নির্ধারণ না করে আল্লাহর উপর ছেড়ে দিতেন। এক্ষেত্রে তা'বীল ও তাফয়ীজ পাওয়া যায়। ***শব্দের আক্ষরিক অর্থ পরিত্যাগের কারণে এটি তা' বীল। আবার সম্পূর্ণ বিষয়কে আল্লাহর উপর ন্যস্ত করার কারণে এটি তাফয়ীজ।***

৩। তা'বীল মায়াত তানজীহ হল, শব্দের আক্ষরিক অর্থ পরিত্যাগ করার পর সম্ভাবনাময় কোন একটা অর্থ গ্রহণ করা। **শুরুতেই তারা এর আক্ষরিক অর্থ পরিত্যাগ করেছেন। এটা হল তা'বীলে ইজমালী।** এরপর তারা উক্ত শব্দের অন্যান্য ব্যবহার দেখতেন। এক্ষেত্রে আরবী ভাষার নিযম অনুযায়ী বক্তব্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ একটা অর্থ গ্রহণ করতেন। যেমন, ইয়াদ বা হাত। প্রথমে তারা আক্ষরিক অর্থ বাদ দিতেন। এরপর আরবী ভাষার নিয়ম অনুযায়ী বক্তব্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ একটা অর্থ নিতেন। যেমন, কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইহুদীদের সম্পর্কে বলেছেন; **তারা বলে, আল্লাহর হাত বন্ধ (কৃপণ অর্থে)।** এর প্রতিবাদে আল্লাহ তায়ালা বলেন, **<u>আল্লাহর উভয় হাত লম্বা। এখানে ইবনে কাসীর সহ অনেক মুফাসসির 'আল্লারহ উভয় হাত প্রশস্ত' কে রুপক অর্থে নিয়েছেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তায়ালা অধিক দানশীল।</u>**

ব্যবহার অনুযায়ী কখন **ইয়াদ অর্থ শক্তি। কখনও নিয়ামত। কখনও ক্ষমতা। এধরণের প্রায় পচিশটা অর্থ ও এর ব্যবহার রয়েছে আরবী ভাষায়। স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী অর্থ গ্রহণ করা। এটাকে তা'বীলে তাফসিলি বলে।**

প্রশ্ন: উপরের তিনটি মতই কি সালাফ থেকে প্রমাণিত?

উত্তর:

অবশ্যই। তবে তাদের কেউ কেউ একেকটা প্রাধান্য দিয়েছেন। সকলেই একটা বিষয়ের একমত হননি। তবে তিনটি বিষয়ই সালাফ থেকে প্রমাণিত।

প্রশ্ন: প্রসিদ্ধ মত কোনটি?

উত্তর:

তিনটি বিষয় সালাফদের থেকে প্রমাণিত হলেও **প্রসিদ্ধ মত হল তাফয়ীজ মায়াত তানজীহ।**

প্রশ্ন: কেউ কেউ বলে সালাফ তা' বীল করতেন না?

উত্তর:

এটা তাদের নামে মিথ্যাচার। **সালাফ থেকে দু'ধরণের তা'বীলই** প্রমাণিত।

১। তা'বীলে ইজমালী।

২। তা'বীলে তাফসালী।

প্রশ্ন: এগুলোর ব্যাখ্যা কী?

উত্তর:

শব্দের আক্ষরিক অর্থ পরিত্যাগ করা হল তা'বীলে ইজমালী (সামগ্রিক তা'বীল)। এটা সমস্ত সালাফ করেছেন।

শব্দের আক্ষরিক অর্থ বাদ দেয়ার পর সম্ভাবনাময় কোন একটা অর্থ গ্রহণ করা হল তা'বীলে তাফসালী। এটাও অসংখ্য সালাফ থেকে প্রমাণিত।

প্রশ্ন: বর্তমান সালাফীদের সাথে সালাফের বিরোধ কোথায়?

উত্তর:

১। সালাফ তানজীহ করতেন। কিন্তু বর্তমান সালাফীরা তানজীহ করে না। সালাফ আক্ষরিক অর্থ পরিত্যাগ করেছেন, কিন্তু সালাফীদের মূল হল, তারা আক্ষরিক অর্থে বিশ্বাস করে।

২। সকল সালাফ কাইফকে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু সালাফীরা কাইফ সাব্যস্ত করে। তবে তারা বলে কাইফ অজ্ঞাত। কিন্তু সালাফ বলতেন, কোন কাইফ নেই। তারা বলে, কাইফ আছে কিন্তু অজ্ঞাত।

৩। অধিকাংশ সালাফ তাফয়ীজ মা'য়াত তানজীহ করতেন। কিন্তু সালাফীদের কাছে তাফয়ীজ হল নিকৃষ্ট বিদয়াত।

৪। সালাফ শব্দের আক্ষরিক অর্থ পরিত্যাগ করার কারণে দেহবাদ ও সাদৃশ্যবাদ থেকে মুক্ত ছিলেন, কিন্তু বর্তমান সালাফীরা আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করার কারণে বিশ্বাসের দিক থেকে অধিকাংশ সালাফী দেহবাদী ও সাদৃশ্যবাদী।

প্রশ্ন: সালাফীদেরকে দেহবাদী বা সাদৃশ্যবাদী বললেন কেন?

উত্তর:

কারণ তারা আক্ষরিক অর্থে বিশ্বাস করে। আর আক্ষরিক অর্থে আল্লাহর জন্য হাত সাব্যস্ত করলে সেটা দেহবাদই হয়।

প্রশ্ন: তারা যে বলে, আল্লাহর হাত আল্লাহর হাতের মত?

উত্তর:

হাতের আক্ষরিক অর্থ পরিত্যাগ না করে একথা বলে কোন লাভ নেই। হাতের আক্ষরিক অর্থ হল, এটা দেহের একটা অংশ বা অঙ্গ। যার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ আছে। আপনি যদি হাতের মূল অর্থ বাদ না দেন, আর বলেন, আল্লাহর হাত আল্লাহর মতই, তাহলেও সাদৃশ্যবাদ থাকে। **আপনি আসলে মনে করছেন, আমাদের হাত ছোট-খাট। কিন্তু আল্লাহ অসীম হওয়ার কারণে তার হাত প্রকান্ড। এর দ্বারা আপনি শুধু হাতের ধরণের পার্থক্য করেছেন। মূল হাত আপনি আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করেছেন। আমরা বলি, হাত দ্বারা কখনও দেহের অংশ বা অঙ্গ উদ্দেশ্য নয়। মোটকথা হল, বাহ্যিক অর্থ সম্পূর্ণভাবে বাদ না দিতে পারলে আপনি সাদৃশ্যবাদ থেকে মুক্ত নন। আপনি যতই বলেন, আপনি আল্লাহর হাত তার শান অনুযায়ী। কারণ আল্লাহর শানই হল, তিনি একক। অঙ্গ বা অংশ থেকে মুক্ত।**

প্রশ্ন: উপরের তিনটি মতের মধ্যে কোনটি উত্তম।

উত্তর:

তানজীহের বিষয়ে কোন মতবিরোধ নেই। এ বিষয়ে সকলেই একমত। সুতরাং তানজীহ অবশ্যই থাকতে হবে। এরপর আরবী ভাষার ব্যবহার অনুযায়ী যদি তা'বীল খুব স্পষ্ট হয়, তাহলে তা'বীল করাটাই উত্তম। আর যদি সম্ভাব্য অর্থ আরবী ভাষা সমর্থন না করে তাহলে সেক্ষেত্রে তাফয়ীজ করা হবে। তবে বিষয়টি যেহেতু ইজতিহাদী (গবেষণা নির্ভর), এজন্য তানজীহ করার পর যে কোন একটা মত গ্রহণের সুযোগ আছে। তবে যেসব বিষয় বাস্তবে কোন গুণ নয় বরং দেহের অংশ বা অঙ্গ বোঝায়, সেসব ক্ষেত্রে তা'বীল করাই উত্তম।

প্রশ্ন: সিফাতের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা রহ: এর মাজহাব কী ছিল?

উত্তর:

ইমাম আবু হানিফা রহ: কিছু ক্ষেত্রে ইসবাত মায়াত তানজীহ করেছেন। যেমন, ইয়াদকে সিফাত বলে তার আক্ষরিক অর্থ বাদ দিয়ে বলেছেন 'ইয়াদ' কোন অঙ্গ নয়। **আবার কিছু ক্ষেত্রে তা'বীল মায়াত তানজীহ করেছেন। যেমন, আল্লাহর নৈকট্য ও দূরত্বের ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন, আল্লাহর নৈকট্য স্থানগত নয়।** আবার পাপী বান্দা আল্লাহর থেকে দূরে। এই দূরত্ব স্থানগত নয়। এখানে স্পষ্ট **তা'বীল মায়াত তানজীহ করেছেন।** ইমাম আবু হানিফা রহ: এর থেকে যদি ফিকহুল আকবার ও আবসাত প্রমাণিত হয়, তাহলে এটি তার মাজহাব হবে। ***নতুবা ইমাম আবু হানিফা রহ: এর আকিদা হিসেবে সেটাই মূল ধরা হবে, যা ইমাম ত্বহাবী রহ: আকিদাতুত ত্বাহীবিয়া তে লিখেছেন। কারণ তিনি শুরুতেই বলেছেন, এই আকিদাগুলো ইমাম আবু হানিফা রহ, ইমাম আবু ইউসুফ রহ: ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ: এর আকিদা।***

যেহেতু আল-ফিকহুল আকবার ও আবসাতের প্রামাণ্যতা নিয়ে প্রশ্নের সুযোগ রয়েছে, এজন্য এগুলোর উপর ভিত্তি করে ইমাম আবু হানিফা রহ: এর সুনিশ্চিত মাজহাব নির্ধারণ করাটা কঠিন। **ইমাম ত্বহাবী রহ: যেহেতু স্পষ্ট করেছেন যে, আকিদাতুত ত্বহাবীর আকিদাগুলি ইমাম আবু হানিফা রহ: ও তার ছাত্রদ্বয়ের, এজন্য আকিদাতুত ত্বাহাবীকে মূল ধরাটাই অগ্রগণ্য।**

প্রশ্ন: আপনি বলেছেন, যেসব বিষয় বাস্তবে কোন গুণ বোঝায় না, সেগুলোর ক্ষেত্রে তা'বীল করা উত্তম। যেমন, হাত, পা, চোখ, পায়ের পিন্ডলী। অথচ আমরা জানি, তা'বীল করলে সিফাত অস্বীকার করা হয়। তা'বীল করে কি আপনি সিফাত অস্বীকার করছেন না?

উত্তর:

এসব শব্দ থেকে সিফাত প্রমাণের বিষয়টা গবেষণা নির্ভর (ইজতেহাদী)। আর এ গবেষণা ভুল ও সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিষয়টা যে গবেষণা নির্ভর এটা বোঝার জন্য কয়েকটা উদাহরণ দেই।

উদাহরণ-১:

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, فأينما تولوا فثم وجه الله তোমরা যেদিকেই ফিরো, সেদিকে আল্লাহর চেহারা রয়েছে (আক্ষরিক অনুবাদ)। এই আয়াতে আল্লাহর চেহারা দ্বারা কী উদ্দেশ্য? আয়াত কি আল্লাহর চেহারা প্রমাণের জন্য এসেছে?

১। ইবনে তাইমিয়া এই আয়াতকে সিফাতের আয়াত মনে করতেন না। তিনি আল্লাহর চেহারা এর ব্যাখ্যা করেছেন কিবলা দ্বারা। এর স্বপক্ষে তিনি অনেক সালাফের বক্তব্যও এনেছেন। এ আয়াতটি তার নিকট সিফাতের আয়াত নয়। আল্লাহর চেহারা দ্বারা সিফাত উদ্দেশ্য নয়। এটি ছিল ইবনে তাইমিয়া রহ: এর ইজতিহাদ বা গবেষণা।

২| আবার ইবনে তাইমিয়া এর ছাত্র ইবনুল কাইয়্যিম আয়াতটিকে সিফাতের আয়াত মনে করতেন। তার মতে, আল্লাহর চেহারা দ্বারা বাস্তবেই আল্লাহর চেহারা উদ্দেশ্য। **চেহারা আল্লাহর একটি সিফাত বা গুণ। এটি হল ইবনুল কাইয়্যিম রহ: এর ইজতিহাদ।**

স্পষ্টত: উস্তাদ ও ছাত্রের ইজতিহাদে বিস্তর পার্থক্য লক্ষণীয়। একই আয়াত একজনের কাছে সিফাত, অন্যজনের কাছে সিফাত নয়। এটা মূলত: ইজতিহাদের পার্থক্যের কারণে হয়েছে।

উদাহরণ-২:

হাদীসে এসেছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা সাত শ্রেণির মানুষকে তার ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। হাদীসের শব্দে ছায়া আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। আল্লাহর ছায়ায় সাত শ্রেণির মানুষকে জায়গা দিবেন।

১। হাদীছে যেহেতু আল্লাহর ছায়া বলা হয়েছে, এজন্য শায়খ ইবনে বাজ এর মতে ছায়া আল্লাহর একটি সিফাত। তিনি মনে করতেন, আল্লাহর ছায়া আছে। এটা ছিল তার ইজতিহাদ।

২। অপর দিকে সৌদি আরবের মান্যবর সালাফী আলেম শায়খ ইবনে উসাইমিন এর কঠোর বিরোধীতা করেছেন। তার মতে, ছায়া আল্লাহর সিফাত নয়। কিয়ামতের দিন মূলত: আরশের ছায়ায় সাত শ্রেণির মানুষকে জায়গা দেয়া হবে।

উদাহরণ-৩:

সালাফীদের মৌলিক বিশ্বাস হল, আল্লাহর দু'টি হাত রয়েছে। এই দুই হাতের একটি কি ডান হাত এবং অপরটি কি বাম হাত? এ বিষয়ে শায়খদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

১। শায়খ ইবনে উসাইমিন ও শায়খ ইবনে বাজ এর মতে আল্লাহর বাম হাত আছে। তারা মুসলিম শরীফের একটি হাদীস থেকে এর প্রমাণ দিয়ে থাকেন। যেখানে বাম হাত আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

২। শায়খ নাসীরুদ্দীন আলবানী এর মতে আল্লাহর কোন বাম হাত নেই। এ বিষয়ে মুসলিম শরীফের হাদীসটি শায (বিচ্ছিন্ন বর্ণনা)।তিনি এ বর্ণনা গ্রহণ করেননি।

এ বিষয়ে আরও অনেক উদাহরণ দেয়া যাবে। বিস্তারিত জানার জন্য **‘সালাফী আলেমদের আকিদাগত মতবিরোধ’** শিরোনামের নোটগুলি দেখতে পারেন।

মোটকথা, সিফাত প্রমাণের বিষয়টি সম্পূর্ণ ইজতিহাদী বা গবেষণা নির্ভর। এটা শরীয়তের অকাট্য বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত বিষয় না। কারও কাছে কোন একটা আয়াত বা হাদীস সিফাত এর প্রমাণ হলেও অন্যের কাছে সেটি সিফাতের দলিল নয়। যার কাছে বিষয়টি সিফাত, তিনি দাবী করছেন যে এটি আল্লাহর সিফাত। কিন্তু যার গবেষণায় এটি সিফাত নয়, তিনি বলছেন, আয়াত বা হাদীস সিফাত প্রমাণ করছে না।

বিষয়টি গবেষণা নির্ভর হওয়ার কারণে একজনের গবেষণার কারণে অন্যকে সিফাত অস্বীকারকারী বলার কোন সুযোগ নেই। কারণ অস্বীকারের প্রশ্ন পরে আসবে। তার কাছে তো বিষয়টি সিফাত হিসেবেই প্রমাণিত নয়। এক্ষেত্রে একজনের গবেষণাকে অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়া যেমন অন্যায়, একইভাবে যার কাছে বিষয়টি সিফাত হিসেবে প্রমাণিত নয়, তাকে সিফাত অস্বীকারকারী বলাটাও অন্যায়।

আপনার প্রশ্নের উত্তর হল, যিনি তা’বীল করছেন, তিনি উক্ত আয়াত বা হাদীসকে সিফাতের আয়াত বা হাদীস মনে করছেন না। তার ইজতিহাদে এই আয়াত বা হাদীস আল্লাহর কোন গুণ প্রমাণের জন্য আসেনি। আপনার ইজতিহাদে হয়ত বিষয়টা কোন গুণ প্রমাণ করছে, কিন্তু যিনি তা’বীল করছেন তার কাছে এটি গুণ প্রমাণ করছে না। যেমন, শায়খ ইবনে বাজ ছায়াকে আল্লাহর গুণ মনে করলেও ইবনে উসাইমিন ছায়াকে আল্লাহর গুণ মনে করেননি। এক্ষেত্রে আপনি কাকে সিফাত অস্বীকারকারী বলবেন? আর ইবনে বাজ এর এই ইজতিহাদ কি সবার মেনে নেয়া জরুরি?

মূলকথা হল, সিফাত প্রমাণের বিষয়টি গবেষণার উপর নির্ভর করছে। যার গবেষণায় বিষয়টি সিফাত নয় এবং তিনি এর তা’বীল করেছেন, তাকে আপনার গবেষণার কারণে সিফাত অস্বীকারকারী বলার সুযোগ নেই। এর দ্বারা আপনি আপনার গবেষণা সবাইকে মানতে বাধ্য করছেন। বাস্তবে অন্য সবাই আপনার গবেষণা মানতে বাধ্য নয়।

আহলে সুন্নতের অসংখ্য আলেমের ইজতিহাদ হল, হাত, পা, চোখ, পায়ের পিন্ডলী, দেহের পাশ এগুলো সিফাত নয়। যেসব আয়াত বা হাদীসে এগুলো আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, এগুলো আল্লাহর সিফাত প্রমাণের জন্য আসেনি। তাদের কাছে বিষয়গুলো সিফাত হিসেবেই প্রমাণিত নয়। এখন আপনার গবেষনায় বা অন্য কোন আলিমের গবেষণায় এগুলো সিফাত হতে পারে। আপনার গবেষণার কারণে যাদের কাছে এগুলো সিফাত হিসেবেই প্রমাণিত নয়, তারা সিফাত অস্বীকারকারী হবে কেন?

আপনি হয়ত দু'পক্ষের গবেষণার মধ্যে যে কোন একটা প্রাধান্য দিতে পারেন। সেটা ভিন্ন বিষয়। কিন্তু আপনার ইজতিহাদের কারণে অন্য পক্ষ সিফাত অস্বীকারকারী হবে না।

প্রশ্ন: আপনি বলেছেন, কিছু ক্ষেত্রে তা'বীল মায়াত তানজীহ প্রাধান্য পাবে। ইসবাত ও তাফয়ীজের উপর একে প্রাধান্য দেয়ার কারণ কী? অথচ সালাফ ইসবাত মায়াত তানজীহকে প্রাধান্য দিয়েছেন?

উত্তর:

যেহেতু বিষয়টা ইজতেহাদী, এজন্য এবিষয়ে যেকোন একটা মতকে প্রাধান্য দেয়ার সুযোগ আছে। আর তিনটি বিষয়ই যেহেতু সালাফ থেকে প্রমাণিত, এজন্য কোন একটাকে প্রাধান্য দিলেও সেটা সালাফেরই মত হিসেবে গণ্য হবে। **কিছু কিছু সালাফ তাফয়ীজকে প্রাধান্য দিয়েছেন, এর অর্থ এই নয় যে, যেসব সালাফ তা'বীল করেছেন, তাদের মাজহাবটি ভুল। সালাফের কেউ কেউ হয়ত তা'বীলের বিরোধীতা করেছেন, কিন্তু অন্যান্য সালাফ থেকে তা'বীল প্রমাণিত।** তাদের বিরোধীতার কারণে একথা বলার সুযোগ নেই যে, তা'বীল সালাফের মাজহাব নয়।

মোটকথা, তানজীহের পর ইসবাত, তাফয়ীজ, তা'বীল থেকে যে মতটিই গ্রহণ করা হবে, সেটা সালাফেরই মত হিসেবে গণ্য হবে। যেহেতু সবগুলিই সালাফ থেকে প্রমাণিত। আবার কোন একটি মতকে প্রাধান্য দিলে মূলত: সালাফের একটা মতকে আরেকটার উপর প্রাধান্য দেয়া হল।

কিছু ক্ষেত্রে তা'বীলকে তাফয়ীজের উপর প্রাধান্য দেয়ার কিছু মৌলিক কারণ উল্লেখ করছি।

১। অনেক আয়াত বা হাদীসে রুপক অর্থটাই মূল। রুপক অর্থ না নিলে আয়াত বা হাদীসের বক্তব্য বিকৃত হয়, সেক্ষেত্রে অবশ্য তা'বীল করতে হবে।

যেমন,

ক) সূরা কাসাসের ৮৮ নং আয়াত। আল্লাহর চেহারা ব্যতীত সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। এখানে সালাফ থেকে দু'টি তা'বীল বর্ণিত আছে।

➤**আল্লাহর সত্ত্বা ব্যতীত সব কিছু ধ্বংস হবে। এখানে চেহারা দ্বারা সত্ত্বা উদ্দেশ্য।**

➤**আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কৃত নেক আমল।**

দ্বিতীয় তা'বীলটি ইমাম বোখারী রহ: সহীহ বোখারীতে উল্লেখ করেছেন।

এ আয়াতে তা'বীল না করে বাহ্যিক অর্থ নিলে আয়াতের অর্থ বিকৃত হয়।

খ) পবিত্র কুরআনের সুরা দাহরে (আয়াত-৯) আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ

এই আয়াতের আক্ষরিক অর্থ হল, **আমরা তোমাদেরকে আল্লাহর চেহারার জন্য আহার্য দান করি।** মূল অর্থ হল, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি। এ আয়াতে 'আল্লাহর চেহারা' দ্বারা যদি তা'বীল না করে বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহলে আয়াতের অর্থ ও উদ্দেশ্য বিকৃত করা হয়। এধরণের **তাহরীফে মা'নাবী (পরোক্ষ বিকৃতি)** আবশ্যক হলে আয়াতের তা'বীল করা জরুরি।

গ) কেউ কেউ সূরা হুদের ৩৭ নং আয়াত দ্বারা আল্লাহর চোখ প্রমাণের চেষ্টা করেছে। আয়াতের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করলে আল্লাহর বহু চোখ সাব্যস্ত করা হয়। আবার বাহ্যিক অর্থ গ্রহণের কারণে আয়াতের বক্তব্য বিকৃত হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا

আয়াতের বাহ্যিক অর্থ হল,**হে নূহ, আমার চোখসমূহ দ্বারা নৌকা তৈরি করো।**

আয়াত দ্বারা বহু চোখ সাব্যস্ত হয়। আবার সেই চোখসমূহ দ্বারা নৌকা তৈরির আদেশটিও অসম্ভব। আয়াতের মূল উদ্দেশ্য ও অর্থ এটি হতে পারে না। **এজন্য এ আয়াতে তা'বীল না করলে তাহরীফ আবশ্যক হয়। তাফসীরে ইবনে কাসীরে এর অর্থ করা হয়েছে, আমার সম্মুখে বা তত্ত্বাবধানে নৌকা তৈরি করো।**

২। যেসব ক্ষেত্রে বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করলে কুফুরী-শিরকী আবশ্যক হয়, সেসব ক্ষেত্রে তা'বীল করা জরুরি। যেমন,

➤ হাদীসে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, **আমি বান্দার হাত হয়ে যায়। আমি বান্দার পা হয়ে যায়। এই হাদীসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করলে কুফুরী আবশ্যক হয়।**

➤কুরআনে এসেছে, **আল্লাহ হলেন আসমান-জমিনের নূর বা আলো। এ আয়াতের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করলে কুফুরী আবশ্যক হয়।**

➤হাদীসে এসেছে, **তোমরা সময়কে গালি দিও না। কারণ আল্লাহ হলেন সময়। এই হাদীসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করলে কুফুরী হবে।**

➤কুরআনে এসেছে, কাফেররা আল্লাহকে ভুলে গেছে, আল্লাহ তায়ালাও তাদেরকে ভুলে গেছেন। **এ আয়াত থেকে বাহ্যিক অর্থ নিয়ে একথা বলা কুফুরী হবে যে, আল্লাহ তায়ালা ভুলে যান।**

➤হাদীসে এসেছে, আমি ইয়ামান থেকে আল্লাহর শ্বাস-প্রশ্বাস পাচ্ছি। এই হাদীসের বাহ্যিক অর্থ নিলেও কুফুরী হবে।

এ ধরণের আরও অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে যেখানে তা'বীল না করলে কুফুরী-শিরকী আবশ্যক হয়। এসব ক্ষেত্রে তা'বীল করা জরুরি।

৩। কোন আয়াত বা হাদীসের বাহ্যিক অর্থ যদি আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য না হয়, তাহলে এই বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগের বিষয়ে সমস্ত সালাফ একমত। যেমন, আল্লাহর ক্ষেত্রে নুজুল দ্বারা কখনও উপর থেকে নীচে নামা উদ্দেশ্য হবে না। শব্দের বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করাও তা'বীল। **কারণ তা'বীল বলা হয়,**

صرف اللفظ عن ظاهره

অর্থ: শব্দের বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করা।

সিফাতের ক্ষেত্রে এধরণের তা'বীলের কথা সমস্ত সালাফই বলেছেন। পরিভাষায় একে **তা'বীলে ইজমালী বা সামগ্রিক তা'বীল বলে।** সুতরাং **কোন শব্দের বাহ্যিক অর্থ আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য না হলে ঐ শব্দের বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগের বিষয়ে সমস্ত সালাফ একমত ছিলেন।** তা'বীলে ইজমালী না করলে দেহবাদ ও সাদৃশ্যবাদ আবশ্যক হবে। উভয়টি মারাত্মক কুফুরী।

সালাফের মধ্যে যারা সিফাত সাব্যস্ত করেছেন অথবা যারা তাফয়ীজ করেছেন, তাদের সকলেই তা'বীলে ইজমালী করেছেন। তা'বীলে ইজমালী একটা ঐকমত্যপূর্ণ বিষয়।

৪। অনেক ক্ষেত্রে তা'বীলে ইজমালীর পাশাপাশি তা'বীলে তাফসীলি করাও উত্তম। **তা'বীলে তাফসীলি হল, শব্দের বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করার পর সম্ভাব্য কোন রুপক অর্থ গ্রহণ করা।** যেমন, আরবী ইয়াদ এর বাহ্যিক অর্থ হাত। কিন্তু আরবীসহ বিভিন্ন ভাষায় হাতের অনেক ব্যবহার আছে। কাউকে কৃপণ বোঝানোর জন্য আমরা বলি, তার হাত খাট। কোন নেতার ক্ষমতা

বোঝানোর জন্য বলি, তার হাত অনেক লম্বা। আরবীতেও এধরণের অসংখ্য রুপকের ব্যবহার আছে। যেসব জায়গায় আনুসঙ্গিক বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, বক্তা রুপক অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছেন, সেক্ষেত্রে তা'বীলে তাফসীলি করতে হবে। যেমন, হাদীসে এসেছে,

إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن

অর্থ: বনী আদমের অন্তরসমুহ আল্লাহর দুই আঙ্গুলের মধ্যে।

এই হাদীস দ্বারা এটা কখনও উদ্দেশ্য নয় যে, প্রত্যেক মানুষের অন্তরে আল্লাহর দুই আঙ্গুল রয়েছে। বক্তব্য থেকে উদ্দেশ্য খুবই স্পষ্ট। মানুষের অন্তরের উপর আল্লাহর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। এখানে আল্লাহর আঙ্গুল সাব্যস্ত করা, প্রত্যেকের মানুষের অন্তরে আল্লাহর আঙ্গুল আছে, এটা বলা উদ্দেশ্য নয়। বক্তার বক্তব্য থেকে তা'বীলে তাফসীলি স্পষ্ট হওয়ার কারণে এখানে তা'বীল করাটা উত্তম।

৫। কিছু শব্দ বাস্তবে কোন সিফাত বা গুণ বোঝায় না। কিন্তু রুপক অর্থে কখনও গুণের অর্থে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন, হাত, পা, চোখ। এগুলো পৃথিবীর কোন ভাষাতেই আক্ষরিক অর্থে গুণ বোঝায় না। এর আক্ষরিক অর্থ পরিত্যাগ করে একে গুণের অর্থে নেয়া সম্ভব। তবে এটি অপ্রচলিত তা'বীল হিসেবে গণ্য করা হবে। হাত শব্দ ব্যবহার করে যদি আমি ক্ষমতা, নেয়ামত ইত্যাদি রুপক অর্থ নেই, তাহলে সেটি প্রচলিত রুপক হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু আমি যদি হাতের বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করে বলি, হাত একটি গুণ, তাহলে এটা আরবী ভাষার প্রচলিত রুপকের মধ্যে থাকবে না। **ইমাম আ'মাদী রহ: এর মতে হাত, পা এগুলোকে সিফাত বা গুণ বলা হল, অপ্রচলিত ও দূরবর্তী রুপক (তাজাউঝে বায়ীদ)। সালাফের মধ্যে যারা হাত, পা, চোখকে সিফাত বলেছেন, তারা মূলত: দূরবর্তী তা'বীল করেছেন।** বাহ্যিকভাবে যদিও মনে হয়, তারা তা'বীল করছেন না বা তা'বীলের বিরোধীতা করছেন, কিন্তু বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এটি তা'বীলে বায়ীদ বা দূরবর্তী তা'বীল।

১। তারা যখন শব্দের বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করছেন, তখন এটি তা'বীলে ইজমালী।

২। এরপর যখন ঐ শব্দকে সিফাত বা গুণ বলছেন, তখন এটি তা'বীলে বায়ীদ বা দূরবর্তী তা'বীল। কারণ শব্দটি আসলে কোন গুণ বোঝায় না। ইয়াদ নামে আরবীতে কোন গুণ নেই। কাদাম নামে কোন গুণ নেই। ইয়াদ বা কাদাম আরবী ভাষায় কোন গুণ না বোঝানো সত্ত্বেও একে গুণের অর্থে নেয়াটা ব্যাপক তা'বীল। যা প্রচলিত তা'বীল থেকেও দূরবর্তী।

সালাফের মধ্যে যারা হাত, পা, চোখকে সিফাত বলতেন, তারা মূলত: তা'বীলে বায়ীদ বা দূরবর্তী তা'বীল করেছেন। আর বাস্তবতা হল, দূরবর্তী বা অপ্রচলিত তা'বীলের চেয়ে প্রচলিত তা'বীল উত্তম। এজন্য ইয়াদকে সিফাত বলার

চেয়ে ইয়াদকে ক্ষমতা বা অন্য কোন অর্থে তা'বীল করা উত্তম। ***ইমাম আ' মাদী রহ: এবিষয়ে আরও বিস্তারিত লিখেছেন তার 'আবকারুল আফকার' নামক কিতাবে।***

৬। সালাফসহ আহলে সুন্নতের বহু আলিমের মতে এগুলো মুতাশাবিহাত এর অন্তর্ভূক্ত। এগুলো যদি মুতাশাবিহাত হয়, তাহলে এর দ্বারা সিফাত প্রমাণ করা কতটুকু সঠিক?

মুতাশাবিহ বিষয় কি কোন কিছু প্রমাণে দলিল হওয়ার যোগ্য? **ইমাম শাতিবি রহ: এর মতে মুতাশাবিহকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করে কোন কিছু প্রমাণ করা বিদয়াত।** কারও কাছে যদি এ সংক্রান্ত আয়াত বা হাদীস মুতাশাবিহ হয়, তাহলে তার জন্য এগুলো দ্বারা সিফাত প্রমাণ করার সুযোগ থাকে না। এজন্য যেসব আয়াত বা হাদীসে হাত, পা, চোখ ইত্যাদির কথা আছে, এগুলোকে মুতাশাবিহ গণ্য করলে এর দ্বারা কোন সিফাত প্রমাণ করার সুযোগ নেই। ***সিফাত প্রমাণের জন্য মুহকাম আয়াত বা হাদীস প্রয়োজন। আর এগুলো যেহেতু মুহকাম নয়, এজন্য এগুলো দ্বারা সিফাত প্রমাণ করাটা দলিলের বিবেচনায় দুর্বল।***

৭। হাত, পা, চোখ এগুলো মুলত: সিফাত হিসেবে আসেনি। ইজাফত হিসেবে এসেছে। যেমন, হাসানের বই। এখানে বই হাসানের দিকে সম্পৃক্ত হয়েছে ইজাফত হিসেবে। গুণ হিসেবে নয়। এই ইজাফাতকে সিফাত বা গুণ বলার জন্য পৃথক দলিল প্রয়োজন। আর এসব ইজাফাতকে সিফাত বলার ভাষাগত, যৌক্তিক বা শরয়ী কোন দলিল নেই। শরয়ী বা আকলী দলিল ছাড়া ইজাফাতকে সিফাত বলাটা যৌক্তিক হতে পারে না।

৮। আল্লাহর হাত, আল্লাহর চোখ, আল্লাহর রুহ সবগুলিই ইজাফাত। শব্দের ব্যবহারে সামান্যতম কোন পার্থক্য নেই। যারা হাত বা চোখকে সিফাত বলেন, তারা রুহকে আল্লাহর সিফাত বলেন না। যদিও বাংলাদেশী কিছু আহলে হাদীসদের আকিদার কিতাবে রুহ বা আত্মাকেও আল্লাহর সিফাত বলা হয়েছে। একই ধরণের ব্যবহার থাকা সত্ত্বেও পাত, পা, চোখকে সিফাত কেন বলা হবে এবং রুহ বা আত্মাকে আল্লাহর সিফাত কেন বলা হবে না? পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তিনি আদম আ: এর মাঝে তার রুহ ফুৎকারের মাধ্যমে প্রবেশ করিয়েছেন। এই আয়াত থেকে রুহকে আল্লাহর সিফাত বলা হবে না কেন? আর আল্লাহর সেই সিফাত আদম আ: এর মাঝে প্রবেশ করানো হয়েছে, এই বিশ্বাসকে কুফুরী বলা হবে কেন?

মূল বিষয় হল, কোন ইজাফাতকে সিফাত বলব এবং কোনটাকে বলবনা, এটা কে নির্ধারণ করবে? আর কোন কোন মূলনীতির আলোকে নির্ধারণ করা হবে? ছায়ার ইজাফাত আল্লাহর দিকে হওয়ার কারণে ইবনে বাজ ছায়াকে আল্লাহর সিফাত বললেন? তিনি

কোন মূলনীতির আলোকে ছায়াকে সিফাত বললেন? আবার ইবনে উসাইমিন: ছায়াকে সিফাত বলতে অস্বীকৃতি জানালেন। তিনি এই ইজাফাতকে সিফাত বলেন না কেন?

৯। সালাফের অনেকে তা'বীলে তাফসিলির বিরোধীতা করেছেন, তা'বীল সম্ভাবনাময় হওয়ার কারণে। সুনিশ্চিত না হওয়ার কারণে তারা তা'বীলের বিরোধীতা করেছেন। ইজাফাতের মাধ্যমে যদি সিফাত সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে এক্ষেত্রেও বিষয়টি সম্ভাবনাময় থাকে। এটি অকাট্যভাবে প্রমাণ করে না যে, এটি আল্লাহর সিফাত। ইয়াদ আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে একথা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে না যে, আল্লাহর হাত রয়েছে। **আরবী ভাষায় এধরণের বহু ব্যবহার রয়েছে। যেমন, কুরআনে 'দিনের চেহারা', 'সত্যের পা', 'নম্রতার ডানা', 'কুরআনের দুই হাত' ইত্যাদি বহু ব্যবহার রয়েছে।** এগুলো প্রমাণ করে না যে, দিনের চেহারা রয়েছে। সত্যের পা রয়েছে। একইভাবে আল্লাহর দিকে হাত সম্পৃক্ত হলেই এটা প্রমাণ করে না যে, আল্লাহর হাত রয়েছে। কুরআনের দিকে দুই হাত সম্পৃক্ত করা হয়েছে। কেউ তো এটা বলে না যে, কুরআনের দুই হাত আছে? আল্লাহর ক্ষেত্রে হাতের ইজাফাত হলেই কেন বলা হবে যে, আল্লাহর হাত রয়েছে? সম্ভাবনার কারণে তা'বীল যদি বর্জনীয় হয়, তাহলে একই কারণে এসব আয়াত বা হাদীস থেকে সিফাত প্রমাণও বর্জনীয় হওয়া উচিত।

১০। যে কোন সিফাত আল্লাহর বিশেষ পরিচয় ও মহত্ব তুলে ধরে। আল্লাহ সর্বময় জ্ঞানী। এর দ্বারা আল্লাহর মহত্ব ও বড়ত্ব বোঝা যায়। কিন্তু হাত, পা, চোখ এগুলো কোন মহত্ব বা বড়ত্ব প্রকাশ করে না। এগুলোকে অনেক সময় আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করতেই মানুষ দ্বিধা করে। এছাড়া এজাতীয় যত আয়াত ও হাদীস আছে, সবগুলি মিলালেও পরিপূর্ণ কোন পরিচয় স্পষ্ট হয় না। **বহু হাত, এক পা, বহু চোখ, দেহের এক পাশ, এক পায়ের পিন্ডলী এগুলো আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করলেও এটি একটি অসম্পূর্ণ পরিচয় তুলে ধরে।** আল্লাহর সিফাতের মূলই ছিল আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরা, এগুলোকে সিফাত বলার কারণে এর দ্বারা অস্পষ্টতা বেড়েছে। মূল বিষয় হল, এগুলো আল্লাহর কোন বিশেষ পরিচয় বা মহত্ব তুলে ধরে না। এগুলোকে সিফাত সাব্যস্ত করার মূল আবেদনটি এখানে অনুপস্থিত। অনেক ক্ষেত্রে এগুলো নুকস বা ত্রুটি হিসেবে গণ্য করা হয়। যেমন, হাত। মানুষের হাত তার একটি দুর্বলতাকে দুর করার জন্য এসেছে। কোন কিছু ধরার জন্য সে হাতের মুখাপেক্ষী। হাত মানুষের দুর্বলতার প্রতীক। এই অভিযোগটি তাদের জন্য প্রযোজ্য যারা আক্ষরিক অর্থে আল্লাহর জন্য হাত সাব্যস্ত করে।

পুরো আলোচনার উপসংহার হল, **যেসব বিষয় বাস্তবে কোন গুণ বোঝায় না, বরং অঙ্গ বা দেহের অংশ বোঝায় এগুলোর ক্ষেত্রে তা'বীল করা উত্তম। তবে তা'বীলের শর্ত ঠিক রেখে তা'বীল করতে হবে। আরবী ভাষায় এর সমর্থন থাকতে হবে। আনুসঙ্গিক আলোচনার সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে।** এ বিষয়ে ইমাম ইজ ইবনে আব্দুস সালাম রহ: বলেন,

طريقة التاويل بشرطه اقربهما الي الحق

অর্থ: তা'বীল ও তাফয়ীজের মধ্যে শর্ত মেনে তা'বীলের পদ্ধতি সত্যের অধিক নিকটবর্তী।
(আল-বাহরুল মুহীত, খ-৩, পৃ-৪৪০)

প্রশ্ন: সিফাতে খাবারিয়্যার ক্ষেত্রে আশআরী- মাতুরিদি আকিদা আসলে কী?

উত্তর:

সালাফের আকিদাই মুলত: আশআরী-মাতুরিদি আকিদা। সালাফ থেকে প্রমাণিত প্রত্যেকটি মতই আশআরী-মাতুরিদিগণ গ্রহণ করেছেন। সালাফের সাথে আশআরী-মাতুরিদি আকিদার মৌলিক কোন বিরোধ নেই। সালাফের মৌলিক মাজহাব ছিল তানজীহ। আল্লাহ তায়ালাকে যে কোন ধরণের সাদৃশ্য থেকে মুক্ত বিশ্বাস করা। তানজীহের পর ইসবাত, তাফয়ীজ, তা'বীল সবগুলোকেই তারা সমর্থন করেন। তাদের মৌলিক আকিদার কিতাবগুলিতে বিস্তারিত রয়েছে।

প্রশ্ন: বর্তমান সালাফীরা আশআরী- মাতুরিদি আকিদার বিরোধীতা করে কেন?

উত্তর:

এর কয়েকটি কারণ আছে।

১। সালাফীরা তাদের আকিদার মূল বানিয়েছে শব্দের আক্ষরিক অর্থে বিশ্বাসের উপর। সালাফ, আশআরী-মাতুরিদি সকলেই শব্দের আক্ষরিক অর্থ বর্জনের উপর একমত। ইয়াদ বলে তারা হাতের আক্ষরিক অর্থ পরিত্যাগ করেছেন। তারা স্পষ্ট করেছেন, ইয়াদ কখনও দেহের কোন অঙ্গ নয়। সালাফীদের সাথে এই মৌলিক জায়গায় বিরোধের কারণে তারা আশআরী-মাতুরিদি আকিদার বিরোধীতা করে।

২। সালাফের অনুসরণে আশআরী-মাতুরিদিগণ বলেন, আল্লাহর জাত ও সিফাতের কোন কাইফ নেই। কিন্তু সালাফীরা বলে কাইফ আছে, কিন্তু কাইফ অজ্ঞাত।

৩। বহু আয়াত ও হাদীসে সালাফ থেকেই অসংখ্য তা'বীল বর্ণিত আছে। এসব তা'বীল আরবী ভাষাও সমর্থন করে। আশআরী-মাতুরিদিগণ এসব তা'বীলকে সমর্থন করেন। পক্ষান্তরে সালাফীরা এসব তা'বীল সালাফ থেকে বর্ণিত হলেও তারা এগুলো গ্রহণ বা সমর্থন করে না। **এমনকি তাদের কেউ কেউ ইমাম তিরমিজি রহ: এর তা'বীলকে জাহমিয়াদের তা'বীল আখ্যা দিয়েছে। সালাফীদের স্বীকৃত আকিদার সমর্থনে কোন তা'বীল হলে, তারা শুধু এগুলো গ্রহণ করে। কিন্তু তাদের আকিদার বিরোধী হলে তা'বীলের বিপক্ষে যায়।** আশআরী-মাতুরিদিগন গ্রহণযোগ্য তা'বীলগুলো গ্রহণ করে থাকেন। এক্ষেত্রে তারা সালাফীদের মত দ্বিমুখী আচরণ বা স্ববিরোধীতা করেন না।

প্রশ্ন: সালাফের ঐকমত্যপূর্ণ মাজহাব যে তানজীহ ছিল, এর দলিল কী?

উত্তর:

দু'ধরণের দলিল।

ক। সালাফের মাজহাব বিশ্লেষণ করে আহলে সুন্নতের বিখ্যাত আলিমগণ লিখেছেন যে, সালাফের মাজহাব ছিল তানজীহ। সিফাতের ক্ষেত্রে সালাফের মাজহাব সম্পর্কে তারা বলেন, সালাফের সকলেই বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগের ব্যাপারে একমত ছিলেন।

খ।স্বয়ং সালাফের বক্তব্য।

উভয় প্রকার বক্তব্য উল্লেখ করছি।

সালাফের মাজহাব সম্পর্কে আলিমগণের বক্তব্য

১। হাদীসে আল্লাহর নুজুলের কথা রয়েছে। নুজুল বা অবতরণ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে **ইমাম নববী রহ: বলেন,**

هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيه مذهبان مشهوران للعلماء سبق إيضاحهما في كتاب الإيمان، ومختصرهما أن أحدهما: وهو مذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين، أنه يؤمن بأنها حق على ما يليق بالله تعالى وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد ولا يتكلم في تأويلها مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن صفات المخلوق وعن الانتقال والحركات وسائر سمات الخلق، والثاني: مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف وهو محكي عن مالك والأوزاعي أنها تتأول على ما يليق بها بحسب مواطنها

شرح مسلم 6 / 36

অর্থ: হাদীসটি সিফাত সংক্রান্ত হাদীসসমূহের একটি। এ বিষয়ে আলিমগণের প্রসিদ্ধ দু'টি মাজহাব রয়েছে। কিতাবুল ইমানে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা আলোচনা করেছি। এখানে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরছি। ১। প্রথম মতটি অধিকাংশ সালাফ ও কিছু কালামবিদের। তাদের মতে উক্ত সিফাতটি আল্লাহর শান অনুযায়ী আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য। তবে সৃষ্টির জন্য প্রযোজ্য বাহ্যিক অর্থটি উদ্দেশ্য নয়। তাদের মতে উক্ত সিফাতের কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হবে না। সেই সাথে অবশ্যই তানজীহ থাকতে হবে। বিশ্বাস রাখতে হবে, আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টির গুণ থেকে মুক্ত। আল্লাহর নুজুল (অবতরণ) এক স্থান থেকে অন্যস্থানে গমন নয়। আল্লাহর নুজুল স্থান পরিবর্তন বা নড়াচড়া নয়। নুজুলের বিষয়ে এজাতীয় সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত বিশ্বাস করে সিফাত সাব্যস্ত করা হবে। (এটা মূলত: ইসবাত মায়াত তানজীহ)। ২। দ্বিতীয় মতটি অধিকাংশ কালামবিদ ও একদল সালাফের মাজহাব। **এটি ইমাম মালিক ও ইমাম আওজায়ী রহ: থেকে বর্ণিত। তাদের মতে স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী তা'বীল করা হবে।**

(শরহে মুসলিম ৬/৩৬)

২। শাইখুল ইসলাম ইমাম বদরুদ্দিন ইবনে জামায়া রহ (৬৩৯-৭৩৩) বলেন,

واتفق السلف وأهل التأويل على أن ما لا يليق من ذلك بجلال الرب تعالى غير مراد، كالقعود والاعتدال... فسكت السلف عنه – وأوله المتأولون

অর্থ: সালাফ ও তা'বীলকারীগণ সকলেই এবিষয়ে একমত যে, এসব শব্দের যে অর্থ আল্লাহর জন্য শোভনীয় নয়, সেগুলো উদ্দেশ্য নয়। যেমন, বসা বা সোজা হওয়া। সালাফ এসব বিষয়ে চুপ ছিলেন। তা'বীলকারীগণ এর তা'বীল করেছেন।
(ইজাহুদ দলিল, পৃ:১০৩, দারুস সালাম, কায়রো)

৩। ইমাম আবু আব্দিল্লাহ উববী রহ: বলেন,

ومذهب أهل الحق في جميع ذلك أن يصرف اللفظ عن ظاهره المحال، ثم بعد الصرف هل الأولى التأويل أو عدمه، بأن يؤمن باللفظ على ما يليق، ويكل علم حقيقة ذلك إلى الله سبحانه وتعالى... ثم الأظهر من قول أهل الحق التأويل

অর্থ: এসমস্ত আয়াত ও হাদীসের ক্ষেত্রে হক্বপন্থীদের মাজহাব হল, আল্লাহর জন্য অসম্ভব বাহ্যিক অর্থটি পরিত্যাগ করতে হবে। বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করার পর তা'বীল করা উত্তম নাকি না করা উত্তম? যেমন বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগের পর কেউ আল্লাহর শান অনুযায়ী উক্ত শব্দকে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করল। এবং শব্দের প্রকৃত অর্থ আল্লাহর দিকে ন্যস্ত করল। (এটি মূলত: তাফয়ীজ)। আহলে হক্বের উভয় বক্তব্যের মধ্যে তা'বীল অধিক স্পষ্ট।
(শরহু সহীহ মুসলিম লিল উববী, ২/৩৮৫)

৪। 'ইস্তিওয়া' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম ইবনে কাসীর রহ: বলেন,

للناس في هذا المقام مقالات كثيرة، ليس هذا موضع بسطها، وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح: مالك، والأوزاعي والثوري، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد وإسحاق وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا وهي إمرارها كما جاءت، من غير تكييف، ولا تشبيه، ولا تعطيل، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله

অর্থ: 'ইস্তিওয়া' বিষয়ে আলিমগণের বিস্তর আলোচনা-পর্যালোচনা রয়েছে। বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে আমরা সালাফে-সালেহীনের মাজহাব অনুসরণ করব। যেমন, ইমামা মালিক, আওজায়ী, সুফিয়ান সাউরী, লাইস ইবনে সা'য়াদ, শাফেয়ী, আহমাদ বিন হাম্বল, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ সহ পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মাজহাব। তারা এসব শব্দকে যেভাবে আছে সেভাবে রাখতেন। কাইফ সাব্যস্ত করতেন না। সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য দিতেন না। **সিফাতকে অস্বীকারও করতেন না।** তাদের মতে, এসব শব্দের বাহ্যিক যে অর্থ সাদৃশ্যবাদীদের মাথায় আসে, এটি কখনও আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য নয়।
(তাফসীরে ইবনে কাসীর, খ:২, ২৮০)

৫। মোল্লা আলী ক্বারী রহ: মেরকাতে নুজুলের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি ইমাম নববী রহ: উল্লেখিত বক্তব্য উল্লেখ করে লিখেছেন,

وبكلامه وبكلام **الشيخ الرباني أبي إسحاق الشيرازي وإمام الحرمين والغزالي** وغيرهم من أئمتنا وغيرهم يعلم أن المذهبين متفقان على صرف تلك الظواهر كالمجيء والصورة والشخص والرجل والقدم واليد والوجه والغضب والرحمة والاستواء على العرش والكون في السماء وغير ذلك عما يفهمه ظاهرها، لما يلزم عليه من محالات قطعية البطلان تستلزم أشياء يحكم بكفرها بالإجماع، فاضطر ذلك جميع الخلف والسلف إلى صرف اللفظ عن ظاهره.

وإنما اختلفوا هل نصرفه عن ظاهره معتقدين اتصافه سبحانه بما يليق بجلاله وعظمته من غير أن نؤوله بشيء آخر، وهو مذهب أكثر أهل السلف وفيه تأويل إجمالي، أو مع تأويله بشيء آخر وهو مذهب أكثر أهل الخلف، وهو تأويل تفصيلي، ولم يريدوا بذلك مخالفة السلف الصالح – معاذ الله أن يظن بهم ذلك – وإنما دعت الضرورة في أزمنتهم لذلك، لكثرة المجسمة والجهمية وغيرها من فرق الضلال، واستيلائهم على عقول العامة، فقصدوا بذلك ردعهم وبطلان قولهم، ومن ثم اعتذر كثير منهم وقالوا: لو كنا على ما كان عليه السلف الصالح من صفاء العقائد وعدم المبطلين في زمنهم لم نخض في تأويل شيء من ذلك

অর্থ: **ইমাম নববী রহ:, ইমাম আবু ইসহাক সিরাজী রহ:, ইমামুল হারামাইন রহ, ইমাম গাজ্জালী রহ: সহ** আমাদের অন্যান্য ইমামগণের বক্তব্য হল, তা'বীল ও তাফয়ীজের উভয় মাজহাবের সকলে এসব আয়াত ও হাদীসের বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগের ব্যাপারে একমত। যেমন, আগমন, সুরত, শাখস (ব্যক্তি), পা, হাত, চেহারা, রাগ, রহমত, আরশের উপর ইস্তাওয়া, আসমানে থাকা। ইত্যাদি। **এগুলোর বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করতে হবে। কেননা, আল্লাহর জন্য এগুলোর বাহ্যিক অর্থ সাব্যস্ত করাও অসম্ভব।** এগুলোর বাহ্যিক অর্থ আল্লাহর জন্য সাব্যস্তকরণ অকাট্যভাবে বাতিল। এগুলোর বাহ্যিক অর্থে বিশ্বাস করলে সকলের ঐকমত্যে (ইজমা) কুফুরী হবে। এজন্য সালাফ ও পরবর্তীগণ বাধ্য হয়ে বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করেছেন।

মতবিরোধের বিষয় হল, বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগের পরে কি উক্ত বিষয়কে আল্লাহর শান অনুযায়ী আল্লাহর গুণ মনে করব; এবং কোন ধরণের তা'বীল থেকে বিরত থাকব নাকি অন্য কোন অর্থে তা'বীল করব? প্রথমটি অধিকাংশ সালাফের মাজহাব। সালাফের এই মাজহাবে বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগের কারণে তা'বীল ইজমালী (সামগ্রিক তা'বীল) পাওয়া যায়। দ্বিতীয় মতটি (বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগের পর অন্য অর্থে শব্দকে তা'বীল করা) পরবর্তী অধিকাংশ আলিমের মাজহাব। এটি মূলত: তা'বীলে তাফসীলি (সুস্পষ্ট তা'বীল)।

পরবর্তীগণ তাদের এই মাজহাবের দ্বারা নাউজুবিল্লাহ কখনও সালাফের বিরোধীতা করার ইচ্ছা করেননি। বরং যুগের চাহিদার কারণে তারা এটি করতে বাধ্য হয়েছেন। তাদের সময়ে মুজাসসিমা (দেহবাদী), জাহমিয়া ও অন্যান্য ভ্রান্ত দলের আধিক্যতার কারণে তারা এ মাজহাবটি ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেন। এসব ভ্রান্ত দল সাধারণ মানুষের বিবেকের উপর রাজত্ব করতে শুরু করে। এজন্য পরবর্তীগণ সুস্পষ্ট তা'বীলের দ্বারা তাদের ভ্রান্তি তুলে ধরেন। তাদের মতবাদ খণ্ডন করেন। পরবর্তী অনেক আলিম ওজর

পেশ করে বলেছেন, সালাফের যুগের মতো আকিদার পরিশুদ্ধি এবং ভ্রান্ত দলগুলোর উপস্থিতি যদি না থাকত, তাহলে আমরা এগুলোর তা'বীল করতাম না।
(মিরক্বাতুল মাফাতিহ, খ:২, পৃ:১৩৬)

৬। জালালুদ্দিন সূয়ুতী রহ: বলেন,

من المتشابه آيات الصفات... وجمهور أهل السنة منهم السلف وأهل الحديث على الإيمان وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى، ولا نفسرها مع تنزيهنا له – تعالى – عن حقيقتها

অর্থ: সিফাতের আয়াতগুলো মুতাশাবিহ এর অন্তর্ভূক্ত। সালাফ এবং মুহাদ্দিসগণসহ অধিকাংশ আহলে সুন্নতের মাজহাব হল, এসব শব্দের উপর ইমান রাখতে হবে। শব্দের উদ্দেশ্য ও অর্থকে আল্লাহর দিকে ন্যস্ত করতে হবে (তাফয়ীজ)। এগুলোর কোন বিশ্লেষণ করা হবে না। বিশ্বাস রাখতে হবে, শব্দের বাহ্যিক অর্থ থেকে আল্লাহ তায়ালা মুক্ত ও পবিত্র (তানজীহ)।
(আল-ইতকান ফি উলুমিল কুরআন,২/১০)

এখানে সুয়ূতী রহ: তাফয়ীজ মায়াত তানজীহ এর কথা বলেছেন।

তানজীহ সম্পর্কে স্বয়ং সালাফের বক্তব্য

কোন শব্দের বাহ্যিক অর্থ যদি ক্রটি, অপূর্ণতা, সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য, সৃষ্টিগত সীমাবদ্ধতা অথবা আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য নয়, এমন হয় তাহলে সালাফসহ সকলের মতে ঐ শব্দের বাহ্যিক অর্থটি পরিত্যাগ করতে হবে। আল্লাহর সমস্ত সিফাতের ক্ষেত্রে সৃষ্টির যাবতীয় সাদৃশ্য ও সীমাবদ্ধতা থেকে পবিত্রতা ঘোষণা করতে হবে। একে পরিভাষায় তানজীহ বলে। আমরা সবাই বিশ্বাস করি, ইলম বা জ্ঞান হল আল্লাহর একটি গুণ। এক্ষেত্রে তানজীহ হল, আল্লাহর ইলম বলতে কখনও অজানা জিনিসকে জানা বোঝান হবে না। আল্লাহ সর্বময় জ্ঞানী। তিনি অনাদী থেকে সব কিছু জানেন। আগে জানতেন না, নতুন করে জানার মাধ্যমে ইলম হয়েছে এমন নয়।

এভাবে আল্লাহর সমস্ত সিফাতের ক্ষেত্রে তানজীহ থাকতে হবে। দেহবাদী ও সাদৃশ্যবাদীরা ছাড়া আহলে সুন্নতের সকলেই তানজীহের ব্যাপারে একমত। আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে তানজীহ না থাকলে অধিকাংশ সময় কুফুরী শিরকীর সম্ভাবনা থেকে যায়।

আমরা এখানে তানজীহের ব্যাপারে সালাফের বক্তব্য উল্লেখ করব। সালাফের বক্তব্যগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। ১। ইসবাত মায়াত তানজীহ। ২। তাফয়ীজ মায়াত তানজীহ। সিফাত সাব্যস্তের সাথে সাথে যারা তানজীহ করেছেন তাদের

বক্তব্যগুলো শুরুতে উল্লেখ করছি। আর যারা পুরো বিষয়টাকে তাফয়ীজ করেছেন, সেই সাথে তাফয়ীজ করেছেন, তাদের বক্তব্য পরবর্তীতে উল্লেখ করব ইনশা আল্লাহ।

১। ইমাম আবু হানিফা রহ (১৫০ হি:)

ইমাম আবু হানিফা রহ: জান্নাতবাসীর জন্য আল্লাহর দর্শন সাব্যস্ত করেছেন। সেই সাথে তিনি স্পষ্ট ভাষায় তানজীহ করেছেন। সৃষ্টির কোন কিছুকে দেখার যাবতীয় সীমাবদ্ধতা থেকে আল্লাহর দর্শনকে মুক্ত বিশ্বাস করতে হবে। যেমন, সৃষ্টির কোন কিছুকে দেখার জন্য দর্শনীয় বস্তুটি কোন একটা দিকে থাকতে হয়। কিন্তু আল্লাহর দর্শনের ক্ষেত্রে কোন দিক সাব্যস্ত করা যাবে না। এজাতীয় সৃষ্টির যত বৈশিষ্ট্য বা সীমাবদ্ধতা সবগুলো থেকে আল্লাহ তায়ালা মুক্ত।

ইমাম আবু হানিফা রহ. আরও বলেন,

"ولقاء الله تعالى لأهل الجنة بلا كيف ولا تشبيه ولا جهةٍ حق"

অর্থ: কোন সাদৃশ্য, অবস্থা (কাইফ) ও দিক ব্যতীত জান্নাতবাসীর জন্য আল্লাহ তায়ালার দর্শন সত্য।
[কিতাবুল ওসিয়্যা, পৃ.৪, শরহে ফিকহুল আকবার, মোল্লা আলী কারী, পৃ.১৩৮]

ইমাম আবু হানিফা রহ: হাতকে আল্লাহর সিফাত বলেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি হাতের বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করে তানজীহ করেছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহর হাত বলতে কোন অঙ্গ উদ্দেশ্য নয়। হাত বলে অঙ্গ উদ্দেশ্য নিলে সাদৃশ্যবাদ ও দেহবাদ হয়। এজন্য তিনি হাতের বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করেছেন।

ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন,

يد الله فوق أيديهم ليست كأيدي خلقه و ليست بجارحة، و هو خالق الأيدي

অর্থ: আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর, তার হাত তার সৃষ্টির হাতের মত নয়; তা অঙ্গ নয়; তিনি হস্ত সমূহের স্রষ্টা।
[ইমাম আবু হানীফা, আল-ফিকহুল আবসাত, পৃঃ ৫৭]

ইমাম আবু হানিফা রহ. আল-ফিকহুল আকবারে বলেছেন, আল্লাহর হাত আল্লাহর একটি গুণ বা বিশেষণ।সুতরাং আল্লাহর হাত দ্বারা ইমাম আবু হানিফা রহ. আল্লাহর একটি বিশেষ গুণ উদ্দেশ্য নিয়েছেন। এটি আল্লাহর কোন অঙ্গ বা অংশ নয়। আপনার ইলম আপনার গুণ, আপনার হাত আপনার কোন গুণ নয়। সুতরাং আল্লাহর হাতের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা রহ.

হাতের প্রচলিত অর্থ উদ্দেশ্য নেননি বরং এটিকে আল্লাহর বিশেষ গুণ সাব্যস্ত করেছেন। হাতের বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করে তিনি স্পষ্ট তানজীহ করেছেন।

২। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ (২৪১ হি:)

ইমাম আহমাদ রহ: থেকে খুবই স্পষ্ট ভাষায় তানজীহ বর্ণিত হয়েছে। তিনি আল্লাহর জন্য ইয়াদ বা হাত সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু তিনি হাতের সমস্ত বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করে তানজীহ করেছে। তিনি বলেছেন, হাত কোন অঙ্গ নয়। এটি দেহ বা দেহ জাতীয় কিছু নয়। এটি নিছক আল্লাহর একটি গুণ বা বিশেষণ।

একইভাবে তিনি আল্লাহর 'ওয়াজহ' বা চেহারা সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু তিনি চেহারার সমস্ত বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করেন। চেহারা দ্বারা কোন আকার-আকৃতি, প্রতিচ্ছবি বা এজাতীয় কোন অর্থ নেয়া যাবে। **'ওয়াজহ' বা চেহারা তার নিকট একটি গুণ।**

আল্লাহর ইস্তিওয়ার ক্ষেত্রেও তিনি স্পষ্ট তানজীহ করেছেন। ইস্তিওয়ার সমস্ত বাহ্যিক অর্থ ও উদ্দেশ্য তিনি পরিত্যাগ করেছেন। কোন কিছু স্পর্শ করে, কোন বস্তুর সাপেক্ষে অবস্থান করে তিনি ইস্তিওয়া করেননি। আর ইস্তিওয়ার কারণে আল্লাহর কোন গুণে পরিবর্তন হয়নি। নতুন কোন গুণ তিনি অর্জন করেননি। ইস্তিওয়ার কারণে তিনি সীমিত বা সীমাবদ্ধ হননি।

এভাবে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ: সকল ক্ষেত্রে স্পষ্ট তানজীহ করেছেন।

ইমাম তামিমী রহ: বর্ণনা করেন,

وَكَانَ يَقُول إِن لله تَعَالَى يدان وهما صفة لَهُ فِي ذَاته ليستا بجارحتين وليستا بمركبتين وَلَا جسم وَلَا جنس من الْأَجْسَام وَلَا من جنس الْمَحْدُود والتركيب والأبعاض والجوارح وَلَا يُقَاس على ذَلِك لَا مرفق وَلَا عضد وَلَا فِيمَا يَقْتَضِي ذَلِك من إِطْلَاق قَوْلهم يَد إِلَّا مَا نطق الْقُرْآن بِهِ أَو صحت عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم السّنة فِيه

অর্থ: তিনি বলতেন, মহান আল্লাহর দুটি হস্ত বিদ্যমান।এদুটি তার সত্ত্বার বিশেষণ। হস্তদ্বয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নয়, দেহের অংশ নয়, দেহ নয়, দেহ জাতীয় কিছু নয়, সীমা সংযোজন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জাতীয় কিছুই নয়। এ বিষয়ে কিয়াস-যুক্তি অচল। এতে কনুই, বাহু ইত্যাদি কোনো কিছুর অস্তিত্ব কল্পনার সুযোগ নেই।কোরআন ও হাদীসে যতটুকু বলা হয়েছে তার অতিরিক্ত মানুষের ব্যবহার থেকে কিছু সংযোজন করা যাবে না।

(ই'তিকাদুল ইমামিল মুনাব্বাল আহমাদ ইবনু হাম্বল, পৃ:২২)

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ: আল্লাহর 'ওয়াজহ' বা চেহারার ক্ষেত্রেও একই কথা বলেছেন। এক্ষেত্রে চেহারা বা মুখমণ্ডলের সমস্ত বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করেছেন। এগুলোর বাহ্যি অর্থ তথা দেহের আকার-আকৃতি উদ্দেশ্য নিলে ইমাম আহমাদ রহ: এর নিকট সে বিদআতি।ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ: বলেন,

أَن لله عز وَجل وَجها لَا كالصور المصورة والأعيان المخططة **بل وجهة وَصفه**

মহান আল্লাহর একটি 'ওয়াজহ' বা মুখমণ্ডল আছে। তার মুখমণ্ডল প্রতিচ্ছবি বা আকৃতি নয় এবং আঁকানো বস্তুর মতও নয়। বরং মুখমণ্ডল তার একটি মহান বিশেষণ।
(ই'তিকাদুল ইমামিল মুনাব্বাল আহমাদ ইবনু হাম্বল, পৃ:১৭)

আরও স্পষ্ট ভাষায় ইমাম আহমাদ রহ: এর তানজীহ বর্ণিত হয়েছে এভাবে,
وَلَيْسَ معنى وَجه معنى جَسَد عِنْده وَلَا صُورَة وَلَا تخطيط وَمن قَالَ ذَلِك فقد ابتدع
তার(ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলের) মতে মুখমণ্ডল অর্থ দেহ, ছবি বা আকৃতি নয়।যদি কেউ তা(মুখমণ্ডলকে দেহ বা আকৃতি) বলে তাহলে সে বিদআতি।
(ই'তিকাদুল ইমামিল মুনাব্বাল আহমাদ ইবনু হাম্বল, পৃ:১৭)

আল্লাহর 'ইস্তিওয়া' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ: তানজীহ করে বলেন,

و لا يجوز ان يقال استوي بمامسة ولا بملاقة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ولم يلحقه تغير ولا تبدل ولا يلحقه الحدود قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش

অর্থ: একথা বলা বৈধ হবে না যে, তিনি কোন কিছু স্পর্শ করে বা কোন কিছুর সাপেক্ষে ইস্তিওয়া করেছেন। আল্লাহ তায়ালা এগুলো থেকে মহাপবিত্র। আরশ সৃষ্টির আগে বা পরে ইস্তিওয়ার কারণে আল্লাহর সত্ত্বাগত বা গুণগত কোন পরিবর্তন হয়নি। তিনি কোথাও সীমাবদ্ধ হননি।

৩। ইমাম ইসমাইলী (৩৭১ হি:) এর বক্তব্য:

وخلق ادم بيده، و يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء بلا اعتقاد كيف يداه، اذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف. ولا يعتقد فيه الاعضاء و الجوارح و لا الطول ولا العرض ولا الغلظ و الدقة ونحو هذا مما يكون مثله في خلق، و انه ليس كمثله شيء

অর্থ: আল্লাহ তা'য়ালা তার 'ইয়াদ' দ্বারা আদম আদম আ: কে সৃষ্টি করেছেন| আল্লার উভয় হাত প্রশস্ত| তিনি যেভাবে ইচ্ছা দান করেন| আল্লাহর হাতের ব্যাপারে কোন কাইফিয়ত বিশ্বাস করা যাবে না| হাতের কাইফ বা ধরণ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে কিছু বলা হয়নি| তবে আল্লাহর হাতের ক্ষেত্রে কখনও এটা বিশ্বাস করা যাবে না যে, এটি কোন অঙ্গ| হাতের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, পুরুত্ব, গভীরতা মোটকথা দেহজাতীয় কোন কিছুই সাব্যস্ত করা যাবে না| আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে সৃষ্টির কোন বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করা যাবে না| মহান আল্লাহর সাথে তুলনীয় কিছুই নেই|
(ই'তিকাদু আহলিল হাদীস, পৃ:৫১)

<u>৪| ইমাম আবুল হাসান আশআরী রহ (মৃত ৩২৪ হি:)</u>

ইমাম আবুল হাসান আশআরী রহ: আল্লাহর জন্য আগমন (মাজী) ও অবতরণ (নুজুল) সাব্যস্ত করেছেন| সেই সাথে তিনি তানজীহ করেছেন| আগমনের বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করেছেন| একইভাবে স্পষ্টভাষায় নুজুলের বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করেছেন| কেননা এসব শব্দের বাহ্যিক অর্থ সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ও সীমাবদ্ধতা| আল্লাহ তায়ালা এধরণের সীমাবদ্ধতা বা সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত| **যেমন, নুজুল এর বাহ্যিক অর্থ হল, উপর থেকে নীচে নামা| কিন্তু এই আক্ষরিক অর্থটি সৃষ্টির জন্য প্রযোজ্য| আল্লাহর নুজুল দ্বারা কখনও উপর থেকে নীচে নামা বা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন বোঝাবে না| এটি সমস্ত সালাফের মাজহাব|** তারা সকল ক্ষেত্রে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ সমস্ত অর্থ পরিত্যাগ করে আল্লাহর জন্য সিফাত সাব্যস্ত করেছেন|

واجمعوا على انه يجئ يوم القيامة و الملك صفا صفا لعرض الامم و حسابها و عقابها و ثوابها، فيغفر لمن يشاء من المذنبين ويعذب منهم يشاء، كما قال: و ليس مجيئه حركة ولا زوالا، وإنمايكون المجئ حركة و زوالا إذا كان الجائي جسما أو جوهرا، فاذا ثبت انه ليس بجسم ولا جوهر، لم يجب ان يكون مجيئه نقلة او حركة، الا تري انهم لا يريدون بقولهم: جائت زيدا الحمى، انها تنقلت اليه او تحركت من مكان كان فيه اذ لم تكن جسم و لا جوهرا، و انما مجيئها اليه وجودها به. وانه ينزل الى سماء الدنيا كمارو النبي صلي الله عليه وسلم ، وليس نزوله نقلة لأنه ليس بجسم و لا جوهر

অর্থ: তারা এ বিষয়ে ঐকমত্য করেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন আগমন করবেন| ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে থাকবে| মানুষকে হিসাবের জন্য আল্লাহর সামনে উপস্থিত করা হবে| হিসেব, ভালো-মন্দের বিচার ও শাস্তি হবে| পাপীদের

যাকে ইচ্ছা তাকে আল্লাহ মাফ করবে। যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন। যেমনটি পবিত্র কুরআনে রয়েছে। আল্লাহর আগমন হরকত বা নড়াচড়া বোঝায় না। আল্লাহর আগমন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন নয়। আগমনকারী দেহবিশিষ্ট বা জাওহার (মৌল উপাদান) হলে তার আগমন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা স্থানান্তরের মাধ্যমে হয়। আল্লাহ তায়ালা যেহেতু দেহবিশিষ্ট বা মৌল উপাদান নন, এজন্য তার আগমন জায়গা পরিবর্তন বোঝায় না। আল্লাহর আগমন কোন হরকত বা গতি বোঝায় না। **যেমন, আমরা যখন বলি, جائت زيدا الحمى (যায়েদের জ্বর এসেছে)। জ্বর এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় এসেছে, এটা বোঝায় না। জ্বর যেহেতু দেহ বা মৌল উপাদান নয়, এজন্য জ্বরের আগমন বলতে কখনও জায়গা পরিবর্তন বোঝায় না।** যায়েদের জ্বর এসেছে বলতে মূলত: যায়েদের শরীরে জ্বরের উপস্থিতি বোঝানো হয়েছে।

একইভাবে হাদীসে এসেছে, আল্লাহ তায়ালা প্রথম আসমানে নেমে আসেন। আল্লাহর নেমে আসার দ্বারা কখনও এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন বা উপর থেকে নীচে নামা উদ্দেশ্য নেয়া হবে না। কেননা আল্লাহ তায়ালা দেহ বা মৌল উপাদান নন। (রিসালাতুন ইলা আহলিস সাগার, পৃ:২২৮)

৫। ইমাম আবু মানসুর মাতুরিদি রহ (৩৩৩ হি:)

ইমাম মাতুরিদি রহ: পরকালে আল্লাহর দর্শন সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু সেই সাথে সুস্পষ্ট ভাষায় তানজীহ করেছেন। আল্লাহর দর্শন সব ধরণের সৃষ্টির বৈশিস্ট্য বা সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হবে। সৃষ্টির কোন কিছুকে দেখার জন্য উভয়ের মধ্যে ন্যুনতম একটি দূরত্ব থাকতে হয়। আর খুব বেশি দূরের বস্তু মানুষ দেখতে পায় না। দর্শনীয় বস্তু আমাদের সামনের দিকে থাকতে হয়। একটি নির্দিষ্ট পরিমাপের আলোর প্রতিফলন থাকতে হয়। এধরণের বহু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কোন কিছু দেখার জন্য সৃষ্টির যত সীমাবদ্ধতা রয়েছে, আল্লাহর দর্শন এসব কিছু থেকে মুক্ত হবে। এটি মূলত: তানজীহ। আহলে সুন্নতের আলেমগণ সিফাত সাব্যস্ত করেন। সেই সাথে স্পষ্ট ভাষায় তানজীহ করে বলেন, আল্লাহ সৃষ্টির সীমাবদ্ধতা বা বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত। এজাতীয় যত সীমাবদ্ধতা আমাদের কল্পনায় আসে, সব কিছু থেকে মহান আল্লাহ তায়ালাকে মুক্ত ও পবিত্র বিশ্বাস করাই হল, সালাফের ঐকমত্যপূর্ণ মাজহাব।

ইমাম আবু মানসুর মাতুরিদি রহ: তার 'কিতাবুত তাউহীদ'-এ লিখেছেন,

فان قيل كيف يرى قيل بلا كيف؛ إذ الكيفية تكون لذي صورة، بل يري بلا وصف قيام وقعود، و اتكاء و تعلق، واتصال و انفصال، و مقابلة و مدابرة، و قصير و طويل، و نور و ظلمة، و ساكن و متحرك، ومماس و مباين، و خارج و داخل، ولا معنى يأخذه الوهم أو يقدره العقل، لتعاليه عن ذلك
كتاب التوحيد-٨٥

অর্থ: যদি প্রশ্ন করা হয়, পরকালে আল্লাহ তায়ালাকে কীভাবে দেখা যাবে? উত্তর দেয়া হবে, কোন কাইফ বা ধরণ ব্যতিরেকে। কেননা আকার-আকৃতি বিশিষ্ট বস্তুর দেখার ধরণ বা কাইফ থাকে। আল্লাহর দর্শন সব ধরণের সৃষ্টির সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হবে। যেমন, দাঁড়ান, বসা, হেলান দেয়া, মিলিত বা পৃথক থাকা, সামনে বা পেছনে থাকা, লম্বা বা খাট হওয়া, অন্ধকার বা আলোতে থাকা, স্থির বা গতিশীল হওয়া, স্পর্শে বা দূরত্বে থাকা, ভেতরে বা বাইরে থাকা এজাতীয় সব ধরণের সৃষ্টির সীমাবদ্ধতা থেকে আল্লাহ তায়ালা মুক্ত। (সৃষ্টিকে দেখতে হলে এসব সীমাবদ্ধতা থাকে, কিন্তু মহান স্রষ্টার ক্ষেত্রে এধরণের সীমাবদ্ধতার কল্পনাও করা যাবে না)। আমাদের ধারণা বা চিন্তাশক্তি কোন কিছু দেখার জন্য যা কিছু কল্পনা করে, সব কিছু থেকে আল্লাহ তায়ালা মুক্ত ও পবিত্র।
(কিতাবুত তাউহীদ-৮৫)

ইমামগণের বক্তব্যগুলো লক্ষ্য করুণ। সালাফের বক্তব্যের সাথে কারও কোন বিরোধ নেই। ইমাম আবুল হাসান আশআরী রহ ও ইমাম আবু মানসুর মাতুরিদি রহ: এর বক্তব্যের সাথে ইমাম আবু হানিফা রহ: বা ইমাম আহমাদ রহ: এর বক্তব্যের কি কোন বিরোধ চোখে পড়ে? এতোদিন আশআরী-মাতুরিদিগণকে বিদআতী প্রচার করছেন, তারা কি আদৌ সালাফের আকিদা সঠিকভাবে বুঝেছেন? আর বুঝে থাকলে সালাফের মত ও পথের উপর অটল আছেন? আমরা ইনশা আল্লাহ পরবর্তী আলোচনাগুলোতেও দেখব যে, আশআরী-মাতুরিদিগণ কীভাবে সালাফের মানহাজকে সংরক্ষণ করেছেন। সালাফের পদাঙ্ক অনুসরণে তারা বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করেননি।

কিছু কিছু ভাই আহলে সুন্নতের প্রতিষ্ঠিত চিন্তাধারা বাইরে কিছু কিছু আলেমের বিচ্ছিন্ন মতামত উপস্থাপন করছেন। এসব ভাইকে মনে রাখতে হবে, ইসলামের ইতিহাসে বিচ্ছিন্ন মতামত ও চিন্তা-ধারার অসংখ্য ব্যক্তিত্ব রয়েছেন। যাদের চিন্তাধারাগুলো মৌলিক আহলে সুন্নতের নীতিমালা হিসেবে স্বীকৃত নয়। এগুলো থাকা মানেই ইলমীভাবে সেটি গ্রহণযোগ্য হয়ে যাওয়া নয়।

এজন্য **উলামাদের তাফাররুদাত বা বিচ্ছিন্ন মতামত উল্লেখ করে আসলে লক্ষ-কোটি উলামাদের হাজার বছরের প্রতিষ্ঠিত মাজহাবের বিরুদ্ধে দাঁড়ান যায় না। অন্তত: এতটুকু বিষয় মাথায় রাখা দরকার।**

আহলে সুন্নতের মৌলিক আক্বিদার বিপরীতে যেসব বক্তব্য আসছে, এগুলোর বিস্তারিত জওয়াব আসবে ইনশা আল্লাহ। আহলে সুন্নতের বুনিয়াদি উসূলের দিক থেকে ভুল কোন মতামতই আমাদের অনুসরণীয় নয়। বিষয়টা সামনে রাখা দরকার।

আহলে সুন্নত ওয়াল জাম'আর মূলনীতি—২

১। আল্লাহ তায়ালা সব ধরণের অঙ্গ-প্রতঙ্গ থেকে মুক্ত। অঙ্গ-প্রতঙ্গের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র

২। আল্লাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয়। তিনি দেহ ও অঙ্গ-প্রতঙ্গ বিশিষ্ট নন। সৃষ্টি যেমন বিভিন্ন অংশ মিলে গঠিত হয়, আল্লাহ তায়ালা এধরণের অংশ অংশ মিলে গঠিত হওয়ার ধারণা থেকে মুক্ত। ছোট বা বড় কোন ধরণের অংশের ধারণা সম্পূর্ণ তাউহীদ পরিপন্থী ও কুফুরী।

৩। কুরআন ও সুন্নাহের কিছু কিছু শব্দ আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে যেগুলো সাধারণত: অংশ বা অঙ্গ বোঝায়। এগুলোর বিষয়ে আহলে সুন্নতের সর্বসম্মত ঐকমত্যপূর্ণ মতামত হল, এগুলো আল্লার ক্ষেত্রে অংশ বা অঙ্গ প্রমাণ করে না। এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর জন্য অংশ বা অঙ্গ সাব্যস্ত করা সুস্পষ্ট কুফুরী।

যেমন, আল্লাহর রং (সিবগাতুল্লাহ), আল্লাহর চেহারা(ওয়াজহুল্লাহ), আল্লাহর হাত (ইয়াদুল্লাহ)।

প্রশ্ন: এগুলো থেকে আল্লাহর অংশ বা অঙ্গ সাব্যস্ত করা যদি কুফুরী হয়, তাহলে পবিত্র কুরআনে এগুলো ব্যবহার করা হয়েছে কেন?

উত্তর: পবিত্র কুরআন যেহেতু আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং আরবী ভাষার অলংকার খুবই উচ্চাঙ্গের, এজন্য পবিত্র কুরআন অলঙ্কারের শাস্ত্রের দিক থেকে সবার উপরে।

ভাষা ও সাহিত্যে অঙ্গ ও অংশের অর্থ নেয়া ছাড়াও এজাতীয় শব্দ ব্যবহার করা যায়। যেমন, কুরআনে আছে দিনের চেহারা (ওয়াজহান নাহার)। অথচ আমরা জানি, রাত-দিনের কোন চেহারা হয় না। এটা সাহিত্যের অলঙ্কার।

কুরআনে আছে, সত্যের পা (কাদামা সিদক)। আমরা সবাই জানি, সত্য - মিথ্যার কোন হাত-পা হয় না। এরপরও ভাষার অলঙ্কারের হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

কুরআনে আছে, পিতা-মাতার জন্য নম্রতার ডানা (জানাহাজ জুল) বিছিয়ে দাও। অথচ আমরা জানি, নম্রতার কোন ডানা হয় না।

সুতরাং আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উচ্চাঙ্গের অলঙ্কারের কারণে এধরণের ব্যবহার থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। এগুলো কোন দোষণীয় বিষয় নয়।

বরং এগুলো কুরআনের সৌন্দর্য্য। কারণ, যখন বলা হয়, তোমরা আল্লাহর রঙে রঙীন হও, তখন যে মর্ম ও উদ্দেশ্য বোঝান হয়, স্বাভাবিকভাবে বললে এতো অর্থবোধক হয় না। যদি বলি, তোমরা ভালো গুণে গুণান্বিত হও, তাহলে এটা অতটা আবেদনময় হয় না।

আগের উদাহরণে পিতার জন্য নম্রতার ডানা বিছিয়ে দেয়ার কথাটাই ধরুণ। সরল-স্বাভাবিকভাবে যদি বলা হয়, তোমরা পিতা-মাতার সাথে ভালো আচরণ করো, এটা যতটুকু আবেদনময়, এর চেয়ে শতগুণ অর্থবহ হলো, তোমরা পিতা-মাতার সামনে দয়া-মায়া ও নম্রতার ডানা বিছিয়ে দাও।

এজন্য, একথা ভাবা কখনও উচিৎ হবে না যে, যেসব বিষয় নিয়ে বিতর্ক হয়, সেসব বিষয় পবিত্র কুরআনে আসলো কেন? নাউজুবিল্লাহ।

পবিত্র কুরআনের ক্ষেত্রে এধরণের আপত্তি বা ধারণা খুবই মারাত্মক। কারণ, যেটা পবিত্র কুরআনের সৌন্দর্য্য সেটাকে কুরআনের ত্রুটি বিবেচনা করা হচ্ছে। অথচ পবিত্র কুরআন সব - ধরণের দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত। এজন্য আমরা দেখি যে, এসব আয়াত ও বক্তব্যে সাহাবায়ে কেরাম কোন আপত্তি করেননি। কারণ তারা মাতৃভাষার অলংকার ও উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন।

প্রশ্ন: এসব শব্দের ক্ষেত্রে অংশ বা অঙ্গ বিশ্বাস না করে কি এগুলো আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা যায়?

উত্তর: এসব শব্দের বাহ্যিক, আক্ষরিক বা সরল অর্থ হল দেহের অংশ বা অঙ্গ। এজন্য অংশ বা অঙ্গের অর্থ বাদ দিলে বাহ্যিক বা আক্ষরিক আর কোন অর্থ অবশিষ্ট থাকে না।

যেহেতু বাহ্যিক সরল অর্থ তথা অংশ বা অঙ্গ অর্থটা সকলের মতে কুফুরী, এজন্য এই কুফুরী অর্থ বাদ দেয়ার পর এই শব্দগুলোর আর কোন সরল অর্থ অবশিষ্ট থাকে না, যা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা যায়।

এখন আমাদের সামনে দু'টি বিষয় থাকছে,

১। মূল শব্দ, যার বাহ্যিক অর্থকে বাদ দেয়া হয়েছে।

২। শব্দের অনেক রুপক অর্থ ও ব্যবহার।

এই পরিস্থিতিতে আলিমদের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে। কেউ বলেছেন, বাহ্যিক অর্থ বাদ দেয়ার পর মূল যে শব্দটা অবশিষ্ট থাকছে, এ শব্দকে আল্লাহর সিফাত বা গুণ বলা হবে। তবে এক্ষেত্রে আলাদা কোন অর্থ সাব্যস্ত করা হবে না।

প্রশ্ন হয়, অর্থহীন আবার শব্দ হয় নাকি? তখন তারা বলেন, অর্থটা আমাদের জানা নেই। আল্লাহ ভালো জানেন। **একে পরিভাষায়, ইসবাত মায়াত তানজীহ বলে। অর্থাৎ বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করে শুধু শব্দটাকে সিফাত বা গুণ সাব্যস্ত করা।**

আরেকদল আলিম বলেন, শব্দকে বাহ্যিক অর্থ থেকে বাদ দেয়ার পর আমাদের দায়িত্ব শেষ। আমরা আগ বেড়ে একে সিফাত বা গুণ বলব না আবার নাকচও করব না। এ বিষয়ে পুরো বিষয়টা আল্লাহর উপর ছেড়ে দিব। একে পরিভাষায় তাফয়ীদ মায়াত তানজীহ (বাহ্যিক অর্থ বাদ দিয়ে শব্দকে আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়া) বলে।

প্রথম মতের সাথে দ্বিতীয় মতের পার্থক্যটা স্পষ্ট। প্রথম দল শব্দকে তার সরল অর্থ থেকে বাদ দেয়ার পর নিজেদের পক্ষ থেকে সিফাত বলছেন। তবে অর্থের বিষয়টি তারা আল্লাহর উপর ছেড়ে দিচ্ছেন। আর দ্বিতীয় দল সিফাতও বলছেন না। নাকচও করছেন না। বরং পুরো বিষয়টিকেই আল্লাহর উপর ছেড়ে দিচ্ছেন। তিনিই ভালো জানেন।

এখানে আরেকদল আছেন। যারা শব্দের সরল অর্থ(অংশ বা অঙ্গ) বাদ দেয়ার পর, শব্দকে পুরোপুরি অর্থহীন বলতে নারাজ। তারা বলেন, কুরআন সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। বাহ্যিক অর্থ যেহেতু নেয়া সম্ভব হচ্ছে না, সুতরাং আরবী ভাষার নিয়ম মেনে এ শব্দের সবচেয়ে উপযোগী রুপক অর্থটি নিতে হবে। পরিভাষায় যাকে, তা'বীল মায়াত তানজীহ বলে।

তাদের বক্তব্য হল, মূল শব্দের সরল বা বাহ্যিক অর্থ (অংশ বা অঙ্গ) নেয়াটা অসম্ভব হলেও পুরো বাক্যের ব্যবহার থেকে একটি সুস্পষ্ট মর্ম বোঝা যায়। আনুষঙ্গিক মর্ম থেকে বক্তার মূল উদ্দেশ্য বোঝা গেলেই যথেষ্ট।

যেমন কুরআনে এসেছে, নিশ্চয় তোমাদেরকে আল্লাহর চেহারার জন্য আহার করাচ্ছি।

এখানে চেহারা শব্দটি সরল বা বাহ্যিক অর্থ (অংশ বা অঙ্গ) নেয়া সম্ভব নয়। বরং এটি সবার মতে কুফুরী। সুতরাং আল্লাহর চেহারা দ্বারা বাহ্যিক চেহারা উদ্দেশ্য নেয়া যাচ্ছে না। তবে আনুষঙ্গিক বক্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে, এখানে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আহার করান হচ্ছে। সুতরাং এখানে চেহারা দ্বারা সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য। এটাই মূলত: তা'বীল মায়াত তানজীহ।

এখন প্রশ্ন হল, আক্বিদায় তো মতবিরোধ হওয়ার কথা না, তাহলে এই মতবিরোধে কে সঠিক?

উত্তর: এখানে অকাট্যভাবে ঐকমত্যের বিষয় আছে। সেটি হল, এসব শব্দের সরল বা বাহ্যিক অর্থে বিশ্বাস করা কুফুরী। এ বিষয়ে উপরের তিনটি দলই একমত। এবং এই ঐকমত্যের বিষয়টিই আহলে সুন্নতের আক্বিদার মূল।

সরল অর্থ বাদ দেয়ার পর শুধু শব্দকে আল্লাহর সিফাত বলা বা কোন কিছু না বলে পুরো বিষয়কে আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়া অথবা আরবী সাহিত্য ও অলংকারের নিয়ম মেনে আনুষঙ্গিক বক্তব্য থেকে রুপক অর্থ নেয়া, সবগুলোই আহলে সুন্নতের নিকট গ্রহণযোগ্য। কোনটাই বাতিল না। সালাফ থেকে উপরের সবগুলিই পাওয়া যায়। একেকজন তাদের বুঝ ও গবেষণা অনুযায়ী একেকটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

প্রশ্ন: তথাকথিত সালাফীদের সাথে পার্থক্য কোথায়?

সালাফীরা এখানে শব্দকে তার বাহ্যিক বা সরল অর্থে বিশ্বাস করতে বলে। যা আহলে সুন্নতের মতে, সুস্পস্ট বাতিল।

তাদেরকে যদি বলা হয়, হাতের বাহ্যিক অর্থ তো অংশ বা অঙ্গ। দেহের অংশ বা অঙ্গের অর্থ ছাড়া হাতের আর তো কোন সরল অর্থ বা উদ্দেশ্য নেই। তখন তারা বলে, না না। আমরা তো অংশ বা অঙ্গের অর্থে বিশ্বাস করি না।

তাহলে হাতের সরল বা বাহ্যিক অর্থটা কী? তখন আর বলতে পারে না।

এজন্য মতবাদ হিসেবে, তথাকথিত সালাফীদের মূলনীতিটা দেহবাদী কুফুরী মূলনীতি। এদের কিছু কিছু আলিম হয়ত অংশ বা অঙ্গে বিশ্বাস করে না, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অংশ বা অঙ্গে বিশ্বাস করার কারণে দেহবাদী আক্বিদা রাখে। এজন্য মূলনীতির দিক থেকে সালাফীরা আহলে সুন্নত বহির্ভূত বাতিল আক্বিদার জামাত। তবে এদের মধ্যে যারা আল্লাহর অঙ্গ বা অংশে বিশ্বাস করে না এবং বাহ্যিক বা সরল অর্থ নেয়ার দাওয়াত দেয় না, এদেরকে ভ্রষ্ট না বললেও যারা সাধারণ মানুষকে বাহ্যিক বা সরল অর্থে বিশ্বাস করতে বলে এরা ভ্রষ্ট।

মোটকথা, মূলনীতির দিক থেকে সালাফী মতবাদ আহলে সুন্নত বহির্ভূত।মূলনীতিটা দেহবাদী আক্বিদার অনুরুপ।

আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে সালফে-সালেহীনের আক্বিদা:পর্ব ২

মূল শিরোনাম:সিফাতে খাবারিয়্যা সম্পর্কে সালাফের আক্বিদা (২য় পর্ব)

ইমাম আলী রেজা ইবনে মুসা কাজিম رضي الله تعالى عنه (:২০৩ হি)

ইমাম আবুশ শায়খ তার 'উযমাত'-তে সনদসহ বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন। মাহদি বিন সাবেক রহ: বলেন,

قدم قوم من وراء النهر علي علي بن موسى فقالوا: نسألك عن مسائل لا يعلمها الا عالم، فقال: سلوا عما شئتم. قالوا: اخبرنا عن معتمد رب العالمين عز ذكره اين كان و كيف كان إذ لا ارض ولا سماء ولا شيئ؟
فقال: معتمد رب العالمين عز ربنا وجل انه هو اين الأين و كيف الكيف و لا كيفية له وكان معتمده على قدرته. فقالوا: نشهد انك عالم اهل الارض.
فقال: الحمد لله الذي لا يحس و لا يمس و لا يجس، و لا تدركه الحواس الخمسة، و لا تصفه الأوهام و لا تبلغه العقول، لم ترى ربنا العيون فتخبر بجيوثيته أو أينونيته أو محدوديته أو كيفوفيته، هو العلي الأعلى حيث ما ينبغي يوحد

العظمة -١/٤٠٥

অর্থ: মধ্য এশিয়া থেকে একদল লোক ইমাম আলী ইবনু মুসা কাজিম রা. এর নিকট আগমন করল। তারা বলল, আমরা আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। বিজ্ঞ আলিমই শুধু এর উত্তর দিতে পারবে।

তিনি বললেন, তোমরা প্রশ্ন করতে পারো।

তারা বলল, যখন কোন আসমান ছিল না, জমিন ছিল না, কোন কিছুই ছিল না, তখন আল্লাহ তায়ালা কোথায় ছিলেন? এ বিষয়ে সঠিক আকিদা-বিশ্বাস কী?

তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস হল, তিনিই 'কোথায়' বলার মত জায়গাকে অস্তিত্ব দিয়েছেন। সব কিছুর ধরণ ও কাইফিয়তের স্রষ্টা তিনি। কোথায়-কেমন এগুলোর স্রষ্টা হলেন তিনি। তার কোন কাইফিয়ত (পরিবর্তনশীল অবস্থা, গুণ বা ধরণ) নেই। তিনিই সর্বশক্তিমান। (অর্থাৎ কোথায়-কেমন এগুলো থেকে আল্লাহ তায়ালা মুক্ত, এগুলোর স্রষ্টা তিনি।)

উত্তর শুনে তারা বলল, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি বিশ্বসেরা আলিম।

এরপর তিনি বললেন,

'সমস্ত প্রশংসা সেই সত্ত্বার যাকে অনুভূতি শক্তি ধারণ করতে পারে না। যাকে স্পর্শ করা যায় না। পঞ্চ ইন্দ্রিয় যাকে বুঝতে পারে না। কল্পনাশক্তি যাকে কল্পনা করতে পারে না। বিবেক যাকে ধারণ করতে পারে না। কোন চোখ তাকে দেখেনি। তার গঠন, অবস্থান, সীমা বা অবস্থা মানুষ কীভাবে বলতে পারে? তিনি সব কিছু থেকে মহান। তাকে সীমাবদ্ধ করা কখনও শোভনীয় নয়।

(আল-আজমা, আবুশ শায়খ, খ:১, পৃ:৪০৫)

ইমাম আলী রেজা ইবনে মুসা কাজিম رضي الله تعالى عنه: ১৪৮ হিজরীতে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। সালাফের যুগের বিখ্যাত ইমাম। সুবহানাল্লাহ। কতো স্বচ্ছ আকিদা-বিশ্বাস লালন করতেন!

তাফয়ীজ মায়াত তানজীহ সম্পর্কে সালাফের বক্তব্য

প্রথম যুগের সালাফগণ সিফাত বিষয়ে যথেষ্ট রক্ষণশীল ছিলেন। তারা এসব বিষয়ে আলোচনা পছন্দ করতেন না। চুপ থাকাকেই তারা শ্রেয় মনে করতেন। এগুলো সিফাত বলা, অর্থ করা বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার বিরোধী ছিলেন। এমনকি সালাফের অনেকে এগুলোকে আরবী বা অন্য ভাষায় অর্থ করাও পছন্দ করতেন না। তারা এক্ষেত্রে পরিপূর্ণ তানজীহের উপর ছিলেন। শব্দের বাহ্যিক অর্থ বা উদ্দেশ্য বা উদ্দেশ্য আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য হলে তারা এগুলোর অর্থ করা বা অনুবাদের বিরোধী হতেন না। বরং তারা এগুলোর প্রতি মানুষকে দাওয়াত দিতেন। কিন্তু বাস্তবতা হল, প্রাথমিক যুগের সালাফগণ মানুষকে এসব বিষয়ের দাওয়ার দেয়ার পরিবর্তে এগুলো থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করতেন।

১। সুফিয়ান বিন উয়াইনা রহ (১০৭-১৯৮ হি)

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রহ: এর মতে সিফাতের বিষয়গুলোর কোন ধরণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হবে না। অর্থ নির্ধারণ, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, আরবীতে উদ্দেশ্য নির্ধারণ কিংবা অন্য কোন ভাষায় অনুবাদ এসব কিছুর বিরোধী ছিলেন তিনি। তার মতে সিফাতের আয়াত বা হাদীস পড়ে চুপ থাকতে হবে। চুপ থাকাই ছিল তার মূল মাজহাব।

مَا وَصَفَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ فَقِرَاءَتُهُ تَفْسِيرُهُ ، لَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يُفَسِّرَهُ بِالْعَرَبِيَّةِ وَلا بِالْفَارِسِيَّةِ

অর্থ: আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে নিজের সম্পর্কে যা বলেছেন, সেগুলো পাঠ করাই হল এর তাফসীর। কারও জন্য এগুলোকে আরবীতে বা ফার্সীতে ব্যাখ্যা করা বৈধ নয়।(আল-আসমা ওয়াস সিফাত, ইমাম বাইহাকী রহ, পৃ:৩১৪)

তিনি আরও বলেছেন,

كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عليه

অর্থ: আল্লাহ তার কিতাবে নিজের সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন, এগুলো তেলাওয়াত (পাঠ) হল এর তাফসীর। তেলাওয়াত করে চুপ থাকতে হবে।
(আল-ই'তিকাদ, ইমাম বাইহাকী রহ, পৃ: ১১৮)

এটা তো সবারই জানা কথা যে, **শুধু তেলাওয়াত কখনও তাফসীর নয়। এরপরেও ইমাম ইবনে উয়াইনা রহ: শুধু তেলাওয়াতকে তাফসীর বলেছেন। এর দ্বারা মূলত: তিনি সিফাতের বিষয়ে আলোচনা থেকে বিরত থাকা, অর্থ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা না করাসহ সব ধরণের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে বিরত থাকার কথা বলেছেন।** বিষয়টাকে স্পষ্ট করার জন্য তিনি বলেছেন তেলাওয়াতের পর এ বিষয়ে কোন আলোচনা হবে না। বরং চুপ থাকতে হবে।

তারা মূলত: পুরো বিষয়টাকে আল্লাহর উপর ন্যস্ত করেছেন। কুরআন-হাদীসে যা রয়েছে, সেগুলোর সত্যতার উপর মৌলিক ইমান রাখতে হবে। কিন্তু যেসব বিষয় আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য নয়, এজাতীয় আয়াত বা হাদীসের ক্ষেত্রে শুধু তেলাওয়াত করে যেতে হবে। উদ্দেশ্য বর্ণনা বা কোন ধরণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হবে না।

এসব আয়াত বা হাদীসের বাহ্যিক অর্থ যদি তারা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করতেন, তাহলে কখনও চুপ থাকতে বলতেন না। তারা বলে দিতেন, এগুলোর বাহ্যিক অর্থে বিশ্বাস করো। কিন্তু কাইফিয়ত অজ্ঞাত। কিন্তু তারা স্পষ্ট করে দিয়েছেন, এগুলো শুধু তেলাওয়াত করতে হবে। আরবীতে বা ফার্সীতে এর কোন অর্থ নির্ধারণ করা হবে না। বরং এসব আলোচনা থেকে বিরত থেকে সম্পূর্ণ চুপ থাকতে হবে। তারা যদি বাহ্যিক অর্থ নিতেন তাহলে যেমন চুপ থাকার কথা বলতেন না, একইভাবে এগুলোর অনুবাদ না করারও নির্দেশ দিতেন না।

<u>২। ইমাম মুহাম্মাদ রহ (১৮৯ হি)</u>

ইমাম মুহাম্মাদ রহ: বলেন,

اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في صفة الرب عز وجل من غير تغيير، ولا وصف، ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئاً من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي – صلى الله عليه وسلم -، وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا
رواه اللالكائي (3/ 432)

অর্থ: পূর্ব থেকে পশ্চিমের সমস্ত ফকীহ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে যা কিছু বলেছেন এবং রাসূল স: থেকে বিশ্বস্তসূত্রে আল্লাহর সিফাত সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, এগুলোর উপর ইমান রাখতে হবে। এগুলোতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সাদৃশ্য ব্যতিরেকে। আজ কেউ যদি এসব সিফাতের ব্যাখ্যা করে, তাহলে সে রাসূল ﷺ এর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হল। মুসলমানদের জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হল। কেননা, তারা এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করেননি, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেননি। বরং তারা কুরআন-সুন্নাহে যা আছে এরপর ফতোয়া দিয়েছেন এবং চুপ থেকেছেন।
(শরহু উসুলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাহ, ইমাম লালকায়ী, খ:৩, পৃ:৪৩২)

এসব শব্দের বাহ্যিক অর্থই যদি উদ্দেশ্য হত, তাহলে চুপ থাকার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল কেন? আর কেউ এগুলোর অর্থ করলে, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলে তিনি তাকে আহলে সুন্নতের জামাত থেকে বের করে দিলেন কেন? এতো কঠিন বক্তব্য দেয়ার কারণ কী? কেউ যদি বলে, হাত দ্বারা বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য, তাহলে তো সে হাতের ব্যাখ্যা করল। হাতের বাহ্যিক অর্থ নির্দিষ্ট করার কথা তো কুরআন-সুন্নাহে নেই। সে এটি নিজের থেকে সংযোজন করেছে। ইমাম মুহাম্মাদ রহ: এধরণের অর্থ নির্ধারণ, উদ্দেশ্য বর্ণনা বা ব্যাখ্যাকে রাসূল স: এর আদর্শের বিপরীত বলেছেন। বরং তার মতে এসব ক্ষেত্রে চুপ থাকাই হল সালাফের মানহাজ।

৩। ইমাম আবু উবাইদ কাসিম ইবনে সাল্লাম রহ (২২৪ হি)

ইমাম আবু উবাইদ কাসিম ইবনে সাল্লাম রহ: বলেন,

إذا سئلنا عن تفسيرها : قلنا : ما أدركنا أحدا يفسر منها شيئا ونحن لا نفسر منها شيئا نصدق بها ونسكت

অর্থ: আমাদেরকে যখন এসব হাদীসের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করা হয়, আমরা এগুলোর ব্যাখ্যা করি না। আমরা এমন কাউকে পাইনি যারা এগুলোর ব্যাখ্যা করেছেন। একারণে আমরাও ব্যাখ্যা করি না। এসব হাদীসকে সত্য মনে করি এবং চুপ থাকি।
(শরহু উসুলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাহ, খ:৩, পৃ:৫২৬)

ইমাম আবু উবাইদ কাসিম ইবনে সাল্লাম রহ: এর সিফাত সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করতেন। তবে তিনি এগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতেন না। তিনি বলেন, আমি এমন কাউকে পাইনি যে এগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে। প্রাথমিক যুগের সালাফদের রীতি এমন ছিল। তারা এগুলোর আলোচনা পছন্দ করতেন না। এগুলোর বাহ্যিক অর্থ সাব্যস্ত করলে অর্থ ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট হওয়ার কারণে এটি তাফসীর বা ব্যাখ্যা হিসেবে গণ্য হবে। ইমাম আবু উবাইদসহ অন্যান্য বহু সালাফ এর বিরোধী ছিলেন।

ইমাম খাত্তাবী রহ: বলেছেন,

كان ابو عبيد القاسم بن سلام وهو احد انهياء اهل العلم يقول: نحن نروي هذه الاحاديث ولا نريغ لها المعاني

অর্থ: ইমাম আবু উবায়েদ কাসিম ইবন সাল্লাম প্রথিতযশা আলিম ছিলেন। তিনি বলতেন, আমরা এসব হাদীস বর্ণনা করি, কিন্তু এগুলোর অর্থ খুঁজি না।
(আকাবিলুস সিকাত, পৃ:১৭৭)

এখানে তিনি স্পষ্ট বললেন, আমরা এগুলোর অর্থ তালাশ করি না। তার মত বহু সালাফের মানহাজ ছিল এটি।

৪। ইমাম ইবনে সুরাইজ রহ (২৪৯-৩০৬ হি)

ইমাম ইবনে সুরাইজ রহ: বলেন,

ان السوال عن معانيها بدعة و الجواب كفر و زندقة

অর্থ: এসবের অর্থ জিজ্ঞেস করা বিদয়াত। আর এর উত্তর হল, কুফুরী ও ধর্মদ্রোহিতা।
(আল-উলু, ইমাম যাহাবি রহ, পৃ:২০৭)

ইমাম ইবনে সুরাইজ রহ: এসবের অর্থ করা বা অনুবাদ করার বিরোধী ছিলেন। তারা যদি এগুলোর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করতেন তাহলে কখনও এসম্পর্কে প্রশ্ন করাকে বিদয়াত বলতেন না। আর এর উত্তর প্রদানকে কুফুরী ও ধর্মদ্রোহিতা বলতেন না। এজাতীয় প্রশ্নের উত্তরকে কুফুরী বলার কারণ হল, এসব আয়াত বা হাদীসের বাহ্যিক অর্থ আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা কুফুরী। নুজুল দ্বারা উপর থেকে নীচে নামা উদ্দেশ্য, হাত দ্বারা অঙ্গ উদ্দেশ্য নিলে কুফুরী হবে। ইতোপূর্বে আমরা এ বিষয়ে মোল্লা আলী ক্বারী রহ: এর বক্তব্য উল্লেখ করেছি। এসব আয়াত বা হাদীসের বাহ্যিক অর্থ আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য নয়। এগুলো আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করলে কুফুরী হবে। এজন্য ইমাম ইবনে সুরাইজ রহ: এ সংক্রান্ত উত্তরকে কুফুরী ও ধর্মদ্রোহিতা আখ্যা দিয়েছেন। ইবনে সুরাইজ রহ: এসব শব্দকে অন্য ভাষায় অনুবাদেরও বিরোধী ছিলেন।

৫। ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মাইন রহ: (২৩৩ হি)

ইবনে কুদামা রহ: নুজুল বিষয়ে ইয়াহইয়া ইবনে মাইন রহ: এর বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। ইয়াহইয়া ইবনে মাইন রহ: বলেন,

صدق به و لا تصفه و قال: اقروه و لا تحدوه

অর্থ: এসব হাদীসের সত্যতার উপর ইমান রাখো। এগুলো ব্যাখ্যা করো না। এরপর তিনি বলেন, হাদীসের সত্যতাকে স্বীকার করো। সৃষ্টিগত কোন সীমাবদ্ধতা সাব্যস্ত করো না।
(জাম্মুল তা'বীল, পৃ:২১)

ইমামগণের বক্তব্যগুলো খুবই স্পষ্ট। কেউ-ই এগুলোর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করছেন না। কেউ কেউ বাহ্যিক অর্থ না নেয়ার ব্যাপারে এত কঠোর ছিলেন যে, অন্য ভাষায় অনুবাদ করতেও নিষেধ করেছেন। অধিকাংশ ইমামই এসব আয়াত ও হাদীসের উপর মৌলিক ইমান রেখে চুপ থাকতে বলেছেন। আল্লাহ ও তার রাসূল যা বলেছেন, যে উদ্দেশ্যে তা সবই সত্য। এতটুকু হল

মৌলিক ইমান। এরপর এ বিষয়ে আর কোন আলোচনা পছন্দ করতেন না। বরং সুস্পষ্টভাবে চুপ থাকতে বলতেন। তারা কোন ধরণের আলোচনাই পছন্দ করতেন না। প্রাথমিক যুগের সালাফগণের মূল মানহাজ ছিল এটি। সময় যত গড়াতে থাকে, এগুলো নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা বাড়তে থাকেন। কেউ এগুলোকে সিফাত বলা শুরু করেন। কেউ তা'বীল করেন। কেউ আরও আগ্রসর হয়ে এগুলোর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করে দেহবাদী ও সাদৃশ্যবাদী হয়। এভাবে আস্তে আস্তে সালাফের মূল মানহাজ (চুপ থাকা) থেকে সরে আসতে থাকে। প্রাথমিক যুগের সালাফগণ চুপ থাকতে বললেও পরবর্তী সালাফদের যুগেই আলোচনা-পর্যালোচনা হতে থাকে। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ চলতে থাকে। যুগের পরিবর্তনে সালাফদের মানহাজেও ব্যাপক পরিবর্তন আসে। একারণে সিফাত বিষয়ে সালাফের মানহাজের মধ্যেই ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। তবে তাদের সকলেই তানজীহের বিষয়ে একমত ছিলেন। সালাফ ও খালাফ (পরবর্তী) সবার ঐকমত্যের কারণে সিফাতের ক্ষেত্রে তানজীহকে আমরা মূল মনে করি। তানজীহের পর 'ইসবাত', 'তাফয়ীজ', 'তা'বীল' যেকোন একটা গ্রহণ করতে পারে। সবগুলোই সালাফ থেকে প্রমাণিত।

<u>সিফাতের আড়ালে দেহবাদ (১)</u>

জাহমিয়া ও মু'তাজেলাদের সাথে সিফাত নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। সেই তর্কে মু'তাজিলা ও জাহমিয়ারা আলাদাভাবে সিফাতকে অস্বীকার করে। মু'তাজেলারা বলে, তিনি এক সত্বা। তিনিই জ্ঞানী। তিনিই ক্ষমতাবান। আলাদাভাবে 'ইলম'(জ্ঞান) নামক সিফাত সাব্যস্ত করা অপ্রয়োজনীয়। বরং এটি খ্রিষ্টানদের মতো একাধিক অনাদি সত্বার ধারণার জন্ম দিবে। যাকে পরিভাষায় তায়াদ্দুদুল কুদামা বলে।

এর বিপরীতে আহলে সুন্নতের একটি দল তৈরি হলেন। যারা সিফাতিয়্যাহ নামে পরিচিত। অর্থাৎ আল্লাহর জন্য তারা সিফাত সাব্যস্ত করলেন। তারা বললেন, ইলম আল্লাহর গুণ বা সিফাত। ক্ষমতা আল্লাহর গুণ বা সিফাত। তবে এর দ্বারা একাধিক অনাদি

সত্ত্বার ধারণা সঠিক নয়।কারণ, ইলম ও কুদরত পৃথক কোন অনাদি অস্তিত্ব নয় যে, একাধিক শব্দের প্রয়োগ হবে। বরং এগুলো স্বয়ং আল্লাহরই গুণ।

এই সিফাতিয়্যাহ দলটির মধ্যে অনেক দল তৈরি হল। মুজাসসিমা, কাররামিয়া, সালেমিয়্যাহ, আশআরী, মাতুরিদি, আছারীসহ নানা দল। সবাই সিফাতিয়্যাহ দলের অন্তর্ভূক্ত।

এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল, কুরআন-সুন্নাহের কোথাও কিন্তু আলাদাভাবে সিফাত কি সিফাত না, সেই আলোচনা হয়নি।

কোথাও বলা হয়নি, এটা আল্লাহর সিফাত। এটা সিফাত নয়। শুরু হল, আরেক বিতর্ক। সিফাত সাব্যস্ত করার পর, কোনটি সিফাত আর কোনটি সিফাত নয়, সেই মূলনীতি নিয়ে চলল তুলকালাম। কারও কাছে একটি বিষয় সিফাত। অন্যদের কাছে সেটি সিফাত নয়।

এরপর আসল সিফাতের নানা বিভাজন। জাতী(সত্ত্বাগত), ফে'লী(কর্মগত), মা'নায়ী, সালবী সহ এজাতীয় প্রকারভেদ গড়ে ওঠল।

এখানে কয়েক ধরণের মতবিরোধ:

১। কোনটি সিফাত, কোনটি সিফাত নয়, এটি কীভাবে নির্ধারিত হবে? এই নির্ধারণের মূলনীতি কী? মূলনীতি কে দিবে? মূলনীতি কতটুকু সঠিক কীভাবে বোঝা যাবে?

২। সিফাতের প্রকারভেদগুলো কীভাবে নির্ধারিত হবে? এই প্রকারভেদেও নানা মতবিরোধ।

৩। সিফাতের সংখ্যা কতগুলো? বাস্তবে তো আল্লাহর সিফাত অসীম। তবে আমাদের জানা ও নির্ধারিত সিফাত কতগুলো?

এসব বিতর্কে আক্বিদার আলিমগণ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মূলনীতি বের করেছেন। সেই মূলনীতির আলোকে উপরের সমস্যা ও বিতর্কগুলো সমাধানের চেষ্টা করেছেন। সালাফের একেকজন তাদের গবেষণা অনুযায়ী একেকটা বিষয়ে মতামত দেন। তাদের সকলের মতামত এক রকম ছিলো না। সালাফের মত ও চিন্তায় নানা পার্থক্য ও বিরোধ স্পষ্ট।

এসব বিষয় আরও পরিমার্জিত হয়ে প্রসিদ্ধ দু'টি ধারা গড়ে ওঠে।

১। আশয়ারী।

২। মাতুরিদি।

<u>কেউ কেউ আছারীদেরকে আলাদাভাবে উল্লেখ করেছেন, তবে বাস্তবতা বিশ্লেষণে আশয়ারী-মাতুরিদি ও আছারী আক্বিদা একই। এজন্য ভিন্ন ভাবে উল্লেখের প্রয়োজন দেখছি না।</u>

মোটকথা এই সিফাতিয়্যাহ ধারার মধ্যে একাডেমিক বিতর্ক কমে আসে। সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমগণ এই দুই ধারার সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করেন। বিভিন্ন অঞ্চলে মু'তাজিলাদের ধারা অব্যাহত ছিল। কিন্তু একটা সময়ে আহলে সুন্নতের মধ্যে তাদের অনুসারীদের সংখ্যা কমতে থাকে। আহলে সুন্নতের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে এবং আহলে সুন্নতের বাইরের কিছু ফেরকা এখনও মু'তাজিলাদের নীতিমালা চর্চা করে।

<u>সিফাত নিয়ে বিতর্কের সূচনাতেই দু'টি প্রান্তিক দল ছিল।</u>

<u>১। সিফাত অস্বীকারকারী জাহমিয়্যাহ বা মু'তাজিলা।</u>

<u>২। সিফাত সাব্যস্ত করতে গিয়ে দেহবাদী বা মুজাসসিমা।</u>

আশয়ারী -মাতুরিদিগণের সাথে উপরের দু'টি ধারার সাথে নিয়মিত বিতর্ক চলমান থাকে। আশয়ারী-মাতুরিদিগণ যেহেতু মৌলিকভাবে সিফাতিয়্যাহ (সিফাত সাব্যস্তকারী দল) আবার দেহবাদীরাও সিফাতিয়্যাহ, এজন্যই উভয় দলের বক্তব্য ও বিরোধ অনেকের কাছে অস্পষ্ট হতে থাকে। বহু দেহবাদী শুধু সিফাত সাব্যস্তকরণকে ঢাল বানিয়ে আশয়ারী-মাতুরিদি ধারায় মিশে যাওয়ার চেষ্টা করে। কেউ ঘাপটি মেরে নিজেদের দেহবাদ প্রচার করে। কেউ ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ: এর অনুসরণের নামে দেহবাদ চালু করে।

সিফাত সাব্যস্তকরণের সুযোগ নিয়ে কিছু কিছু মুহাদ্দিশ স্পষ্ট দেহবাদিতায় লিপ্ত হোন। **<u>হাম্বলীদের বড় একটা অংশ সিফাত সাব্যস্ত করার সুযোগকে ঢাল বানিয়ে দেহবাদী আক্বিদা লালন করা শুরু করে। চাদর, লুংগী, হজরে আসওয়াদ, স্বর্গের বিছানা কোন কিছুই আল্লাহর গুণ হওয়া থেকে বাদ যায় না। আল্লাহর দিকে কোন কিছু সম্পৃক্ত হলেই সেটাকে সিফাত বানিয়ে দেয়।</u>** আশয়ারী-মাতুরিদি আলেমগণ এদেরকে দেহবাদী বলা শুরু করে। এরাও কম যায় না। যে কোন কিছুকে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করেই বলে দিত, আল্লাহর শান অনুযায়ী বা বিলা কাইফ। এই কৌশলের মাধ্যমে আশয়ারী-মাতুরিদিদের তাকফীর থেকে বাচার চেষ্টা করত। তারা মনে করত, আল্লাহর শান অনুযায়ী বললেই বোধ হয় সাত খুন মাফ।

পরবর্তীতে আশয়ারী-মাতুরিদিগণ এই দলকে নতুন একটা নাম দিলেন। **বালকাফা। যারা যে কোন বিষয়কে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করেই বিলা কাইফ (ধরণ ছাড়া) বলে দিতো। তাদের এই বিলা কাইফের কোন বাস্তবতা ছিলো না। এরা**

বলত, <u>জিসমুন লা কাল আজসাম(আল্লাহর দেহ আছে। তবে সেটি অন্য কারও মতো নয়)</u> এভাবে নানা গর্হিত জিনিসও আল্লাহর সিফাত হিসেবে চালিয়ে দেয়া শুরু করল।

একদল তো আরও অগ্রসর হয়ে বলা শুরু করল, আল্লাহর গুপ্তাঙ্গ আর মোচ ছাড়া সবই আছে। নাউজুবিল্লাহ। এসব বলে আবার বলত, এগুলো আল্লাহর শান অনুযাবী বা বিলা কাইফ(ধরণ ছাড়া)।

<u>আহলে সুন্নত তাদের ধোঁকাবাজী সম্পর্কে সচেতন করলেন। ফতোয়া দিলেন, কেউ যদি বলে, আল্লাহর দেহ আছে, আর সেটি অন্য কারও মত নয়, এরপরও সে কাফের। এভাবে আস্তে আস্তে এই ধোঁকাবাজ দেহবাদীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন।</u>

তারা সবাইকে মূলনীতি বলতে শুরু করলেন। আল্লাহ তায়ালা সব ধরণের সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত ও পবিত্র। একইভাবে যে কোন ধরণের ত্রুটি বোঝায় এমন কোন বিষয় আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। একথা বললে কুফুরী হবে যে, আল্লাহ তায়ালা তার শান অনুযায়ী ভুলে যান। কারণ আল্লাহর শানই হল, তিনি ভুলে যাওয়া থেকে মুক্ত।

আপনি যেমন একজন নেককার ভালো মানুষকে বলতে পারবেন না যে, তিনি তার শান অনুয়ায়ী চোর। কারণ, তার শান হলো চোর না হওয়া।

এজন্য এমন অসংখ্য বিষয় রয়েছে যেগুলো আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করাটাই কুফুরী। কারণ এগুলো দোষ-ত্রুটি বোঝায়। এর মাধ্যমে সৃষ্টির সীমাবদ্ধতা স্রষ্টার উপর আরোপ করা হয়। এগুলো তার দিকে সম্পৃক্ত করাটাই কুফুরী। যদিও এখানে বলা হচ্ছে তার শান অনুযায়ী বা বিলা কাইফ (ধরণ ছাড়া)। **<u>কারণ, যেটা শানের বিরোধী, সেটাকে সাব্যস্ত করে শান অনুযায়ী বলাটা এক ধরণের ধোকাবাজী ও উপহাস।</u>** নাউজুবিল্লাহ।

এজন্য সিফাত সাব্যস্তের অনুমতিকে ঢাল বানিয়ে এবং তার শান অনুযায়ী শব্দকে ব্যবহার করে একদল দেহবাদী আল্লাহর শানে এমন অনেক বিষয় সম্পৃক্ত করেছে, যা থেকে তিনি পবিত্র। **<u>সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন (নিশ্চয় আপনার রব যিনি মহান প্রতিপত্তির অধিকারী, তিনি তাদের এসব বিশেষণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত)।</u>**

মনে রাখতে হবে, স্রষ্টার শানের খেলাফ কোন বিষয়কে তার জন্য সাব্যস্ত করাটাই স্বতন্ত্র কুফুরী। এখানে দেখা হবে না, শান অনুযায়ী বলেছি কি না।

কারণ, কোন হিন্দু কখনও বলে না, তাদের ভগবান তাদের মতো। বরং তারা গুণের দিক থেকে ভগবানকে ভগবানের মতই বিশ্বাস করে। ভগবান ভগবানের মত বলা সত্ত্বেও তারা কাফের। কারণ, তারা স্রষ্টার জন্য এমন কিছু বিষয় সাব্যস্ত করেছে, যা স্রষ্টার জন্য প্রযোজ্য নয়।

খ্রিষ্টানদের কথাই ধরুন। তাদের ভ্রান্তির সূচনা হলো কীভাবে? আলিমগণ লিখেছেন, তাদের ধর্মগ্রন্থে কিছু কিছু শব্দ আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছিল। যেমন,'পিতা','পুত্র'। **একটা সময় তারা এগুলোকে আক্ষরিক অর্থে বিশ্বাস শুরু করে। সিফাতুল আব (পিতা হওয়ার গুণ) , সিফাতুল ইবন (পুত্র হওয়ার গুণ) সাব্যস্ত করতে শুরু করে। যাকে আকানিম নাম দিতো। এভাবে সিফাত ও অক্ষরবাদের পথ ধরে তারা আল্লাহর শানের খেলাফ বিষয়কে আল্লাহর জন্য গুণ সাব্যস্ত করা শুরু করে।** এভাবে কুফুরী-শিরকে লিপ্ত হয়।

বর্তমানে দেহবাদীদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো পাবেন। তারা কখনও বলবে না, আল্লাহর গুণ আমার মতো। বরং তারা বলবে, আল্লাহ তো আল্লাহর মতই। এরপর এমন বিষয়কে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করবে যা সুস্পষ্ট কুফুর ও শিরক।

সুতরাং সিফাত সাব্যস্ত করার সুযোগকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে **বর্তমানের বালকাফা (বিলা কাইফ—গর্হিত বিষয় সাব্যস্ত করে বলে ধরণ জানি না)** দেহবাদীদের বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। বিশুদ্ধ আক্বিদার নামে যেন নিরেট কুফুর-শিরকের দিকে আপনাকে না নিয়ে যায়।

সিফাতের আড়ালে দেহবাদ(২)

আশয়ারী-মাতুরিদি ও দেহবাদী, তিনটি দলই যেহেতু সিফাতিয়্যাহ (আল্লাহর সিফাত বা গুণ সাব্যস্তকারী) এজন্য অনেকেই এদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য খুঁজে পায় না। উভয় দলই তো আল্লাহর সিফাত বা গুণ সাব্যস্ত করছে, তাহলে বিরোধটা কোথায়? অথচ তাদের মধ্যে আসমান-জমিনের পার্থক্য। এই সিরিজে আমরা উভয় দলের মৌলিক বিরোধের জায়গাগুলো আস্তে আস্তে চিহ্নিত করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ।

দেহবাদীরা মৌলিকভাবে ইসলামী আক্বিদা যেসব বিকৃতি ঢুকিয়েছে,

১। কুরআন-সুন্নাহের তাহরীফ বা বিকৃতি

কুরআন-সুন্নাহর সমস্ত বক্তব্য আরবী ভাষায়। অন্য যে কোন ভাষার মতো আরবীতেও আক্ষরিক অর্থের পাশাপাশি রুপকের ব্যবহার রয়েছে। এখন কেউ যদি দাবী করে, কুরআনের সব কিছুই রুপক তাহলে সে কুরআন বিকৃত করল। কারণ, কুরআনে আক্ষরিক অর্থ নেয়া হয়েছে অগণিত। একইভাবে কেউ যদি দাবী করে, কুরআনের সব কিছুই বাহ্যিক বা আক্ষরিক অর্থে। রুপক বলে কিছু নেই। তাহলে সেও কুরআন বিকৃত করল। কারণ, কুরআনে অসংখ্য-অগণিত রুপক রয়েছে।

দেহবাদীদের একটি মৌলিক দাবী হল, কুরআন-সুন্নাহে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কিত সকল বক্তব্যই আক্ষরিক অর্থ বা লিটারাল মিনিং এ থাকবে। এগুলোর কোনটিই রুপক নয়। এগুলোকে রুপক দাবী করলে আল্লাহর সিফাত বা গুণ অস্বীকার করা হবে।

দেহবাদীদের এই দাবীটা সুস্পষ্টভাবে কুরআন-সুন্নাহের বিকৃতি (তাহরীফ)। আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর বাধ্য-বাধকতা আরোপ য়ে, তারা আল্লাহর বিষয়ে কখনও রুপক ব্যবহার করতে পারেন না। মায়াজাল্লাহ।

দ্বিতীয়ত: অসংখ্য আয়াত ও হাদীসের রুপক ব্যবহারকে সিফাতের নাম দিয়ে আক্ষরিক বানিয়েছে। এসব রুপক উদ্দেশ্যে আক্ষরিক অর্থে নেয়ার কারণে আল্লাহ ও তার রাসূলের বক্তব্যের মর্ম বিকৃত হয়েছে। কারণ, বক্তা আক্ষরিক অর্থে শব্দ ব্যবহার করলে সেটাকে রুপক বলা যেমন বিকৃতি, একইভাবে রুপক অর্থে শব্দ ব্যবহার করলে সেটাকে আক্ষরিক বলাও বিকৃতি।

২। সিফাত বা গুণ বলার বিদয়াত

আরবী ভাষায় উচ্চাঙ্গের অলঙ্কার রয়েছে। এখানে একই শব্দকে শ'য়ের অধিক অর্থে ব্যবহার করা যায়। ভাষার এই অলঙ্কারকে কাজে লাগিয়ে বক্তা একই শব্দকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে থাকেন।

ভাষাগত দিক থেকে এসব শব্দের ব্যবহার সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রের সৌন্দর্য্য হলেও এসব শব্দকে আক্বিদা বানানো নিয়ে বিতর্কের সূচনা। কুরআন – সুন্নাহের এমন অসংখ্য ব্যবহার রয়েছে যেগুলো ভাষা ও সাহিত্যের বিচারে খুবই উচ্চাঙ্গের, কিন্তু সেটাকে আক্ষরিক অর্থে নিয়ে আক্বিদা বানানো সুস্পষ্ট কুফুরী।

দেহবাদীদের ভ্রান্তির সূচনা হল, **তারা এজাতীয় সকল ব্যবহারকেই আক্ষরিক দাবী করে বসল এবং বলা শুরু করল এগুলো সবই আল্লাহর গুণ বা সিফাত। যেহেতু শব্দগুলো আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত হয়েছে, এজন্য যে কোন শব্দ আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত হলেই তাকে সিফাত বলার ধারা শুরু হল।** যা ছিল ইসলামী আক্বিদা বড় ধরণের বিদয়াত। অথচ তাদের এই মূলনীতি না কুরআনে আছে, না হাদীসে। সম্পূর্ণ একটি বিদয়াতী মূলনীতি ইসলামী আক্বিদায় অনুপ্রবেশ করিয়ে অসংখ্য কুফুরী বিষয়কে আল্লাহর গুণ বা সিফাত বলা শুরু করল। যেমন

1. ক্লান্ত হওয়া (সিফাতুল মালাল)
2. আল্লাহর ছায়া (জিল)
3. দৌড়ান (হারওয়ালা)
4. লুঙ্গি
5. চাদর
6. কা'বার চত্তরের হজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) আল্লাহর ডান হাত
7. স্বর্ণের বিছানা
8. দেহের পাশ (জাম্ব)
9. হাতের তালু
10. আঙ্গুল
11. পায়ের পাতা
12. আত্মা
13. আকৃতি
14. হাতের কব্জি
15. বুক
16. কোমর

৩। সংখ্যা নির্ধারণ

আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত বিষয়গুলোকে সিফাত বলেই ক্ষ্যান্ত হলো না। এগুলোার সংখ্যা নির্ধারণ শুরু করল।

কুরআন – হাদীসের কোথাও 'দু'টি চোখ' সংখ্যা সহ আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত হয়নি। **অথচ তাদের আক্বিদা হল, আল্লাহর 'দু'টি চোখ' রয়েছে।**

কুরআনে যেসব জায়গায় আল্লাহর দিকে আরবী 'আইন' (চোখ) শব্দটি সম্পৃক্ত করা হয়েছে, এগুলোর সবই বহু বচন হিসেবে এসেছে। আর আবরী ভাষায় আক্ষরিক অর্থে বহু বচন তিন বা তিনের অধিক জিনিস বোঝায়।

সব জায়গায় যেহেতু আক্ষরিক দাবী করা হচ্ছে এবং সেগুলোতে সংখ্যাও নির্ধারণ করা হচ্ছে, তাহলে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে 'দু'টি চোখ' নির্ধারিত হলো কীভাবে? অথচ কুরআনে আক্ষরিকভাবে বহু চোখের কথা আছে। সেই বহু চোখকে দু'টি বানান হলো কেন?

একইভাবে কুরআনের অনেক জায়গায় আল্লাহর দিকে 'হাত' সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এগুলো একবচন, দ্বিবচন ও বহু বচনে এসেছে। বেশ কয়েক জায়গায় বহু বচনে 'ইয়াদ' (হাত) আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত হয়েছে। অর্থাৎ তাদের দাবী অনুযায়ী, আল্লাহর বহু হাত রয়েছে। আশ্চর্য্যের বিষয় হল, তারা এক বচনের ব্যবহার ও বহু বচনের ব্যবহারকে বাদ দিয়ে শুধু দ্বিবচনের ব্যবহার নিয়েছে। এবং বলেছে আল্লাহর দু'টি হাত।

কুরআনে যেহেতু বহু হাতের কথা রয়েছে, তাহলে শুধু দু'টি কেন? আক্ষরিক হওয়ার দাবী তো ছিল একথা বলা যে, আল্লহার বহু হাত রয়েছে? তবে শুধু দু'টি কেন?

৪। যুক্তি দিয়ে সিফাত

কুরআন – হাদীসে আল্লাহর দিকে 'জাম্ব' বা দেহের পাশ সম্পৃক্ত করা হয়েছে। সেখান থেকে এটাকেও সিফাত বলা শুরু করেছে। কিন্তু সমস্যা হল, কুরআনে এক বচনে জাম্ব শব্দটি এসেছে। অর্থাৎ দেহের এক পাশ। কিন্তু দেহবাদীরা এখানে থেমে থাকেনি। যদিও এক পাশের কথা আছে, কিন্তু বাস্তবে দুই পাশই আছে।

তারা যুক্তি দিয়েছে,ইমরান বিস হুসাইন رضي الله تعالى عنه কে আল্লাহর রাসূল ﷺ: বলেছেন, তুমি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বে। যদি না পারো, বসে নামাজ পড়বে। যদি না পারো, তাহলে দেহের পাশে ভর করে নামাজ পড়বে।
এই হাদীসে যেমন ইমরান বিন হুসাইন রা: এর ক্ষেত্রে দেহের এক পাশ ব্যবহার করলেও তার দেহের দুই পাশ আছে, একইভাবে আল্লাহর ক্ষেত্রেও যদিও দেহের এক পাশ বলা হয়েছে, তবে দুই পাশই আছে। (মায়াজাল্লাহ)

এভাবে বিভিন্ন কুযুক্তি ব্যবহার করলেও অন্যদেরকে তারা সব – সময় অভিযোগ করে আক্বিদার ক্ষেত্রে তারা যুক্তি ব্যবহার করে।

৫। আহলে সুন্নতকে বিদয়াতী আখ্যা দেয়া

তাদের উপরের এই অপরাধগুলোর সাথে একাত্মতা ঘোষণা না করার কারণে তারা আহলে সুন্নতকে সিফাতকে সিফাত অস্বীকারকারী হিসেবে অপপ্রচার শুরু করে। অথচ সত্য কথা হল, তাদের এসব দেহবাদী সিফাতের কোন শুরু শেষ নেই। মায়াজাল্লাহ, এতো জঘন্য বিষয়কেও সিফাত বলা হয়েছে যে, তাদেরই বহু আলিম সেগুলো অস্বীকার করেছেন।

উপরের বিকৃতির পাশাপাশি তারা আহলে সুন্নত তথা আশয়ারী-মাতুরিদি লক্ষ-কোটি আলিম ও ইমামগণের বিরুদ্ধে নিয়মিত বিষোদগার করে তাদের আমলনামা কলুষিত করে যাচ্ছে। কারণ একটাই। তাদের এই বিদয়াতী পন্থায় তারা কেন গর্হিত বিষয়গুলোকেও সিফাত বলে না।

আহলে সুন্নতকে তারা বিদয়াতী বলেই ক্ষ্যান্ত হয় না বরং ভ্রান্ত ফেরকা জাহমিয়্যা হিসেবে কটাক্ষ করে। অথচ জাহমিয়াদের সাথে আশয়ারী-মাতুরিদি আক্বিদার আকাশ-পাতালের পার্থক্য।

এভাবেই সিফাত সাব্যস্তের আড়ালে ইসলামী আক্বিদায় চলছে দেহবাদী কুফুরী-শিরকের রমরমা প্রচার।

ভ্রান্তির বেড়াজালে সালাফী মতবাদ

বর্তমান সালাফীরা সম্পূর্ণভাবে দেহবাদী আকিদায় বিশ্বাসী। তারা মূলত: ভ্রান্ত ফেরকা কাররামিয়াদের ভ্রান্ত আকিদা বিশ্বাস লালন করে। এসব ভ্রান্ত আকিদাকেই তারা তথাকথিত সহীহ আকিদা হিসেবে প্রচার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। সালাফীদের অন্যতম একটি আকিদা হল, আল্লাহ তায়ালা আরশে বসে আছেন। শুধু তাই নয়, **আল্লাহ তায়ালা রাসূল ﷺকে তার পাশে বসাবেন এটা তাদের মৌলিক আকিদা।** এই ভ্রান্ত ইহুদী আকিদাটি সালাফীদের অনেক বিখ্যাত শায়খ তাদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন। বিশেষভাবে তাদের মান্যবর ও অনুসরণীয় আলেম ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়্যিম তাদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন। আমরা ইতোপূর্বে এ বিষয়ে সালাফীদের নিকট অতীতের শায়খদের বক্তব্য আলোচনা করেছি। আজকের পর্বে পূর্ববর্তী শায়খদের বক্তব্য প্রমাণসহ উল্লেখ করবো ইনশাআল্লাহ।

ইবনে তাইমিয়া রহ. এর বক্তব্য:

১. ইবনে তাইমিয়া তার মাজমুআ ফাতাওয়া (খ.৪, পৃ.২২৯) বলেছেন,

إذا تبين هذا فقد حدث العلماء المرضيون وأولياؤه المقبولون أن محمدا رسول الله يجلسه ربه على العرش معه

"গ্রহণযোগ্য আলেমগণ ও আল্লাহর প্রিয় ওলীগণ বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা আরশের উপর রাসূল ﷺ কে তার পাশে বসাবেন।

তার মতে আরশের উপর আল্লাহর পাশে রাসূল ﷺ এর উপবেশনের আকিদাটি সঠিক আকিদা। এটি জাহমিয়া ছাড়া কেউ অস্বীকার করে না। অর্থাৎ আল্লাহর আরশে উপবেশনের আকিদাটি অস্বীকার করলে ইবনে তাইমিয়া এর মতে সে জাহমিয়া।(স্ক্রিনশট ছিল এখানে)

২.ইমাম আবু হাইয়্যান উন্দুলুসী রহ. [মৃত:৭৫৪ হি:] বিখ্যাত মুফাসসির ছিলেন। আল-বাহরুল মুহীত তার অমর কীর্তি। ইমাম আবু হাইয়্যান উন্দুলুসী রহ. ইবনে তাইমিয়া রহ. এর সম-সাময়িক ছিলেন। **আবু হাইয়্যান উন্দুলুসী রহ. তার তাফসীরে লিখেছেন,**

"আমাদের সম-সাময়িক ইবনে তাইমিয়ার নিজ হাতে লেখা "আল-আরশ" নামক কিতাবে দেখেছি, আল্লাহ তায়ালা কুরসীর উপর উপবেশন করবেন। কুরসীর কিছু অংশ ফাকা থাকবে। যেখানে রাসূল ﷺ. উপবেশন করবেন"
[আল-বাহরুল মুহীত, খ.২, পৃ.২৫৪ , আয়াতুল কুরসীর তাফসীর]

৩. ইবনে তাইমিয়া রহ. **বয়ানু তালবিসিল জাহমিয়া (খ.৩, পৃ.২৭৮)** তে লিখেছেন, "আরশের শাব্দিক অর্থ হল, উপরের দিকের বিবেচনায় এটি খাট বা সিংহাসন এবং নীচের দিকের বিবেচনায় এটি ছাদ। কুরআনে যেহেতু আল্লাহর জন্য আরশ সাব্যস্ত করা হয়েছে, আল্লাহর ক্ষেত্রে যেহেতু এটি ছাদ নয়, সুতরাং আল্লাহর জন্য আরশ হল সিংহাসন। **আরশ আল্লাহর সিংহাসন হওয়াটা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ আরশের উপর রয়েছেন।**

ইবনে তাইমিয়া রহ. এর আকিদা ছিল আল্লাহর ওজন বা ভার রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা আরশে উপবিষ্ট রয়েছেন। এ বিষয়ে তার অনেক বক্তব্য রয়েছে। সংক্ষেপে আলোচনার উদ্দেশ্যে সেগুলো উল্লেখ করা হল না। পরবর্তীতে ইনশাআল্লাহ বিস্তারিত লিখবো।

ইবনুল কাইয়্যিম এর বক্তব্য

১. ইবনুল কাইয়্যিম. তার **আল-বাদাইউল ফাওয়াইদ (খ.৪, পৃ.১৩৮০)** এ একটি কবিতা উল্লেখ করেছেন।

ولا تنكروا أنه قاعد ولا تنكروا أنه يقعده

অর্থ: তোমরা কখনও অস্বীকার করো না যে, আল্লাহ আরশে বসে আছেন। তোমরা এও অস্বীকার করো না যে, রাসূল ﷺকে আল্লাহ তায়ালা আরশে বসাবেন।

২. **মুখতাসারুস সাওয়াকিল মুরসালা (পৃ.১০৯৬)** কিতাবে ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন, **আল্লাহ প্রকৃত অর্থে উপরের দিকে রয়েছেন। আল্লাহর উপরে থাকার বিভিন্ন ধরণ রয়েছে। এর একটি হল, আল্লাহ তায়ালা তার কুরসীর উপর উপবিষ্ট হন।**

৩. খারিজা ইবনে মুসআব (পরিত্যক্ত বর্ণনাকারী) থেকে ভিত্তিহীন (বর্ণনাকারী সাইদ ইবনে সাখর অজ্ঞাত) একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন ইবনুল কাইয়্যিম রহ. তার সাওয়াইকুল মুরসালা কিতাবে। এই বর্ণনাটি শুধু ভিত্তিহীনই নয়, জঘন্য আকিদা প্রচার করা হয়েছে এর মাধ্যমে। এধরনের ভ্রান্ত আকিদা পোষণ না করলে কুফুরীর ফতোয়াও দেয়া হয়েছে। নাউযুবিল্লাহ। ইবনুল কাইয়্যিম রহ. লিখেছেন, *"খারিজা ইবনে মুসআব থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, জাহমিয়াগণ কাফের। তোমরা তাদের সাথে তোমাদের কন্যাদের বিবাহ দিও না। তাদের কারও মেয়ে বিবাহ করো না। তাদের অসুস্থদেরকে দেখতে যাবে না। তাদের মৃত ব্যক্তির জানাযায় অংশগ্রহণ করবে না। তাদের স্ত্রীদেরকে জানিয়ে দাও, তাদের স্ত্রী তালাক। স্বামীর জন্য তাদের স্ত্রী হালাল নয়। এরপর তিনি সূরা ত্বহার পাচ নং আয়াত পর্যন্ত তেলাওয়াত করলেন। **" আল্লাহ তায়ালা আরশের উপর ইস্তেওয়া করেছেন। ' এই আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন, বসা ব্যতীত কখনও কি ইস্তেওয়া হয়? "***
[আস-সাওয়াইকুল মুরসালা, খ.১, পৃ.১৩০৩]

প্রিয় পাঠক, প্রথমে আমরা ইবনে তাইমিয়া এর বক্তব্য উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহ তায়ালা রাসূল ﷺ কে আরশের উপর তার পাশে বসাবেন এটি কেবল জাহমিয়ারা অস্বীকার করে। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা আরশে বসে আছেন এই আকিদা অস্বীকার করলে সে জাহমিয়া হয়ে যাবে। একই কথা ইবনুল কাইয়্যিম রহ. উল্লেখ করলেন। তিনি শুধু জাহমিয়া বলেই ক্ষ্যান্ত হননি, খারিজা ইবনে মুসআবের সুত্রে এদেরকে কাফের সাব্যস্ত করেছেন। এদের জানাযায় অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। স্ত্রী তালাক হয়ে বলে ফতোয়া দিয়েছেন।

সালাফী ভাইদের কাছে আমাদের জিজ্ঞাসা, বর্তমানে কিছু সালাফীকে দেখা যায়, তারা আরশে বসে থাকার আকিদা অস্বীকার করেন। সালাফী শায়খ শহীদুল্লাহ খান মাদানী একে সমাসীন বা বসে থাকার আকিদাকে বিদয়াতও বলেছেন। আমাদের প্রশ্ন হল, আল্লাহ আরশে উপবিষ্ট থাকার আকিদাকে যারা অস্বীকার করছে,

১.তারা কি মুসলমান না কাফের?
২. তাদের স্ত্রী হালাল না কি তালাক হয়ে যাওয়ার কারণে হারাম?
৩. তাদের জানাযায় অংশগ্রহণ করা বৈধ না কি অবৈধ?
৪.এদের কেউ অসুস্থ হলে অন্যান্য সালাফীরা কি তাকে দেখতে যেতে পারবে?

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়,শহীদুল্লাহ খান মাদানী এই আকিদাকে বিদয়াত বলেছে। সুতরাং খারিজা ইবনে মুসআবের সুত্রে ইবনুল কাইয়্যিম রহ. যেই ফতোয়া দিলেন, এর আলোকে আমরা কী বুঝতে পারি? শহীদুল্লাহ খান মাদানীর স্ত্রী তার জন্য হালাল না হারাম? সে মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযায় অন্যান্য সালাফীরা কি অংশগ্রহণ করতে পারবে?

ইবনুল কাইয়্যিম যেহেতু তার কিতাবে এটি সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন, সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের জানতে চাওয়াটা কখনও অযৌক্তিক হতে পারে না। এটির সমাধান হওয়া জরুরি। আশা করি সালাফী ভাইয়েরা অন্যদেরকে জাহমিয়া, মুয়াত্তিলা বলে গালি দেয়ার আগে নিজের অবস্থান যাচাই করবেন। তাদের মান্যবর শায়খদের ফতোয়া অনুযায়ী তারা নিজেরাই জাহমিয়া হয়ে আছে কি না সেটাও যাচাই করা জরুরি। তাদের স্ত্রী হালাল রয়েছে কি না সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য আলেমদেরকে কুফুরী-শিরকের অপবাদ দেয়ার আগে আপনাদের শায়খদের ফতোয়া অনুযায়ী আপনাদের ইমানটাও যাচাই করা আবশ্যক। আশা করি, সালাফী ভাইয়েরা বিষয়টি স্পষ্ট করবেন।

আক্বিদার ব্যাপারে কোনো ছাড় নেই

গত সাত-আট বছরে আমরা জেনারেল ভাইদের মধ্যে নাস্তিকদের খন্ডনে যৌক্তিক জবাব দিয়ে বিভিন্ন বই লিখতে দেখেছি। অথচ অধিকাংশই নিজেদের আক্বিদা বিশুদ্ধির বিষয়ে তেমন ফিকির দেখা যায় না। আমরা তাদেরকে অনুৎসাহিত করছি না। কিন্তু নিজেদের আক্বিদা -বিশ্বাস বিশুদ্ধ না করে নাস্তিকদের বা খ্রিষ্টানদের জওয়াব দেয়াকে প্রাধান্য দেয়া কতটুকু যৌক্তিক হতে পারে?

কারও কারও এজাতীয় বইয়ে তো খুবই আপত্তিকর আকিদার ভুল রয়েছে। সেগুলোর বিষয়ে বললে সবাই বলবে, জনপ্রিয়তা দেখে আমরা হিংসা করি। অথচ বিষয়টি আদৌ হিংসার নয়। বিষয়টি সংশোধনের।

বড় বড় রাঘব বোয়ালদের অবস্থা তো দেখছেন। তাদের আক্বিদাতে কীভাবে দেহবাদ ঢুকে গিয়েছে। অন্যদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। এজন্য সবাইকে আগে নিজের ফিকির করতে হবে। দাওয়াত অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু নিজের আকিদাকে শুদ্ধ করা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

আল-ফিকহুল আকবরে ইমাম আবু হানিফা রহ: বলেন,

واذا أشكل علي الإنسان شيئ من دقائق علم التوحيد فإنه ينبغي له ان يعتقد في الحال ما هو الصواب عند الله تعالي إلي أن يجد عالما فيسأله ولا يسعه تأخير الطلب ولا يعذر بالوقوف فيه)و يكفر ان وقف(

অর্থ: আকিদার সূক্ষ্ম কোন বিষয়ে কারও যদি জটিল অথবা দুর্বোধ্য মনে হয়, তার জন্য সে বিষয়ে অবশ্যই সাথে সাথে সঠিক ইলম অর্জন করা জুরুরি। তবে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ আলিম পাওয়া পর্যন্ত বিলম্বের সুযোগ রয়েছে। তবে এধরণের আলিম খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে বিলম্ব করার সুযোগ নেই। কেউ যদি একাজে বিলম্ব করে তাহলে এ অবস্থায় তার ওজর শরীয়তে গ্রহণ করা হবে। (কিছু নুসখায় আছে) এ অবস্থায় বিলম্ব করতে থাকলে সে কুফুরী করবে বা কাফের হয়ে যাবে।

ইন্টারনেটের কারণে যেহেতু সবার কাছে সব বিষয় খুব সহজে পৌঁছে যাচ্ছে এজন্য উপরের বক্তব্যটি গুরুত্বের সাথে নেয়া দরকার। সাধারণ মানুষ হোক বা আলিম, যদি আক্বিদার মৌলিক বিষয়ে সন্দেহে নিপতিত হয় বা ভ্রান্ত আক্বিদা চর্চা করে থাকে, তবে সাথে সাথে বিশুদ্ধ আক্বিদা শেখার চেষ্টা করতে হবে। এ বিষয়ে কোন ওজর - আপত্তি শরীয়তে গ্রহণযোগ্য হবে না।

সালাফীদের দেহবাদী আক্বিদার প্রমাণ: মুফতি কাযি ইব্রাহীম

আহলে সুন্নতের সঠিক অবস্থান:

➤ আহলে সুন্নতের মতে আল্লাহ তায়ালা এক ও অদ্বিতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্ত্বা। তার সত্ত্বার বাস্তবতা আমাদের জানা নেই। আমরা তার কিছু গুণের মাধ্যমে পরিচয় পেয়ে থাকি। বিভিন্ন যুগে কিছু দেহবাদী ও বাতিল ফেরকার লোকেরা বলেছে, আল্লাহ তায়ালা ‘আকার’ বিশিষ্ট বা আল্লাহর আকার রয়েছে। আহলে সুন্নতের মতে তাদের এ বক্তব্যটি ভুল। আল্লাহ তায়ালা আকার-আকৃতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র।

আহলে সুন্নতের নিকট আল্লাহ তায়ালার আকার-আকৃতি থেকে মুক্ত হওয়ার বিষয়টি ‘সিফাতে সালবী’। অর্থাৎ তারা শুধু আকার-আকৃতিকে নাকচ করেন। কিন্তু তারা আল্লাহ তায়ালা অন্যান্য নিরাকার বস্তুর মতও বিশ্বাস করেন না বা সাদৃশ্যও দেন না। বরং আহলে সুন্নতের মূল বক্তব্য হল, আল্লাহ তায়ালার সত্ত্বার বাস্তবতা আমাদের জানা নেই। যারা আকার সাব্যস্ত করে তাদের বক্তব্য খন্ডনের উদ্দেশ্যেই কেবল বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা আকার বিশিষ্ট নন। এর অর্থ কখনও আল্লাহর জন্য ‘নিরাকার’ গুণটি সাব্যস্ত করা নয়।

২। কুরআন – সুন্নাহে আল্লাহর যেসব গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে, এগুলোর কোনটিই আল্লাহ তায়ালার সত্ত্বার আকার–আকৃতি বর্ণনার জন্য আসেনি। কেউ যদি এককভাবে অথবা সামগ্রিকভাবে এগুলোকে আল্লাহর আকার আকৃতি মনে করে, তাহলে সে কুফুরী করল।

৩। কুরআন-সুন্নাহের কিছু কিছু জায়গায় আল্লাহর দিকে 'হাত', পা ইত্যাদি সম্পৃক্ত হয়েছে। এগুলো দ্বারা কখনও আকার-আকৃতি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। কেউ যদি এগুলো থেকে আকার – আকৃতি বিশ্বাস করে তাহলে সে পথভ্রষ্ট দেহবাদী। আহলে সুন্নতের কিছু ইমামের মতে সর্বোচ্চ এগুলোকে সিফাত বলার অনুমতি আছে। তবে সেটি কখনও আকার-আকৃতি, অংশ বা অঙ্গের অর্থে নয়। সুতরাং যারা 'হাত', পা ইত্যাদিকে আল্লাহর গুণ বলে এবং সেটিকে আকার-আকৃতিও মনে করে, তাহলে তারাও আহলে সুন্নতের মতে পথভ্রষ্ট ও দেহবাদী।

মুফতী কাজী ইব্রাহীম এর ভ্রান্ত বক্তব্য:

"১। *নিরাকার কথাটি নাস্তিকতার শামিল অথবা নিরাকার মানে যার কোন অস্তিত্বই নেই।***"**

জবাব:

আহলে সুন্নতের মতে কাজী ইব্রাহীম সাহেবের এ বক্তব্যটি কুফুরী পর্যায়ের। কারণ, **তিনি আল্লাহর বিশ্বাসের নামে তার আকার-আকৃতিতে বিশ্বাসের দাওয়াত দিচ্ছেন। যা হিন্দুত্ববাদী আক্বিদার অনুরুপ।**

আকার অস্বীকার করলেই যদি কোন কিছুর অস্তিত্ব অস্বীকার হয়, তাহলে এটা দুনিয়ার সাধারণ নিয়মেই ভুল।আল্লাহর অস্তিত্বকে আকারের মুখাপেক্ষী হিসেবে উপস্থাপন করাটাই গোমরাহী। **আল্লাহর অস্তিত্বের বাস্তবতা আমরা জানি না। এর অর্থ এই নয় যে তার আকার থাকতে হবে।** নতুবা তিনি অস্তিত্বহীন হবেন। নাউজুবিল্লাহ। কতো বড় ধৃষ্টতাপূর্ণ কুযুক্তি।

খোদ বস্তুজগতেই আকার ছাড়া অসংখ্য মেটাফিজিক্যাল এনটিটির(Entity) অস্তিত্ব রয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে আমরা এগুলো ব্যবহার করছি। সুতরাং দুনিয়াবী দিক থেকেই তার এই কথা বাতিল।আমাদের বস্তুজগতে বহু বিষয়ের অস্তিত্ব আমরা স্বীকার করি যেগুলোর ফিজিক্যাল কোন রুপ নেই। যেমন, সত্য-মিথ্যা।

আমরা কখনও বলি না, আল্লাহ তায়ালা এসব বস্তুজগতের নিরাকার জিনিসের মতো (নাউজুবিল্লাহ)! বরং উদ্দেশ্য হল, বস্তুজগতের দৃষ্টিকোণ থেকেই কাজী সাহেবের বক্তব্য ভুল। আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ তায়ালার বিষয়ে কোন উদাহরণ দেয়াও জায়েজ নয়। কারণ, আল্লাহ তায়ালার সত্ত্বার বাস্তবতা আমরা জানি না।

"২। *দুনিয়ার সব জিনিসেরই আকার আছে, ঈমানেরও আকার আছে, শব্দেরও একটা ডেসিবল আছে, সৃষ্টির যে কোন বস্তুরই আকার আছে, তাহলে আল্লাহর কি আকার থাকবে না?***"**

জবাব: ভুল যুক্তি বা কুযুক্তি। এখানে সৃষ্টিজগতের নিয়মের উপর স্রষ্টাকে তুলনা করা হয়েছে। যেহেতু প্রত্যেক সৃষ্টিরই আকার আছে, সুতরাং স্রষ্টারও আকার থাকতে হবে, এধরণের যুক্তিই সম্পূর্ণ ভুল। এটাক পরিভাষায় বলে, **কিয়াসুল গায়েব আলাশ শাহেদ। অর্থাৎ দেখা জিনিসের নিময়-কানুন দিয়ে অদেখা জিনিসকে বিচার করা।** এই পদ্ধতিটাই সম্পূর্ণ ভুল।

একথার মাধ্যমে কেমন যেন দাবী করা হয়, স্রষ্টাকে সৃষ্টিজগতের নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে। অথচ সৃষ্টিজগতের নিয়ম-কানুনের স্রষ্টাও তিনি। তিনি যেমন বস্তুজগতের স্রষ্টা, একইভাবে বস্তুজগতের সমস্ত নিয়ম-কানুনেরও স্রষ্টা তিনি। এজন্য নির্দিষ্ট কোন নিয়মের ক্ষেত্রে একথা বলা চলবে না যে, যেহেতু প্রত্যেক সৃষ্টির মধ্যে এই নিয়ম আছে, সুতরাং স্রষ্টার মধ্যেও সেটি থাকতে হবে (নাউজুবিল্লাহ)!এটি চরম পর্যায়ের একটি ভ্রান্ত কুযুক্তি।

"৩। *সহীহ বোখারির হাদীসে এসেছে, আল্লাহ তায়ালা তার আকৃতিতে উপস্থিত হবেন হাশরের ময়দানে, এই হাদীস শোনার পর আকার অস্বীকার করলে সরাসরি আল্লাহর নবীকে অস্বীকার করা হয়।***"**

উত্তর: সহীহ বোখারীর হাদীস শোনার পর আকার অস্বীকার করলে আল্লাহর রাসূল ﷺ: কে অস্বীকার করা হয় না। কারণ, সহীহ বোখারীতে বাহ্যিক এমন অনেক হাদীস আছে, যেগুলোর আক্ষরিক অর্থও আমরা কখনও উদ্দেশ্য নেই না। যেমন, আল্লাহ তায়ালা বান্দার হাত হয়ে যান। বান্দার পা হয়ে যান।

এখন আক্ষরিক অর্থ নিয়ে বান্দাকে আল্লাহর হাত, পা না বললে কখনও আল্লাহর রাসূল ﷺ কে অস্বীকার করা হয়। এটাও কাজী সাহেবের একটা কুযুক্তি। বোখারীর হাদীসে আছে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন যে, আমি অসুস্থ হয়েছিলাম।তুমি আমার সেবা করোনি।
এখান থেকে আক্ষরিক অর্থ নিয়ে কেউ যদি বলে, রাসূলﷺ
এঁর এই হাদীস শোনার পর কেউ যদি না বলে যে আল্লাহ তায়ালাকে অসুস্থ না বললে আল্লাহর রাসূলকে অস্বীকার করা হবে।(নাউযুবিল্লাহ)!হাদীসে এধরণের অসংখ্য ব্যবহার রয়েছে। তো সকল ক্ষেত্রেই কি আক্ষরিক অর্থ না নিলে বলা হবে আল্লাহর রাসূল স: কে অস্বীকার করা হচ্ছে?

আকার অস্বীকার করলে যদি আল্লাহর রাসূল স: কে অস্বীকার করা হয়, তাহলে বোখারীর এ হাদীসের ব্যাখ্যাকারক সমস্ত মুহাদ্দিস হাদীস অস্বীকারকারী হয়ে যাবেন। নাউজুবিল্লাহ। কারণ আহলে সুন্নতের প্রায় সকল মুহাদ্দিস এই হাদীসের আক্ষরিক অর্থ নাকচ

করেছেন। **<u>এই হাদীসে আক্ষরিকভাবে বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা প্রথমে এক সুরতে উপস্থিত হয়েছেন। পরে তার আসল সুরতে উপস্থিত হোন। এখানে আক্ষরিক অর্থ নিলে হিন্দুদের মতো ভগবান নানা আকৃতি ধারন করেন, এমন বিশ্বাস করা হয়। যা সুস্পস্ট কুফুরী।</u>** এখন কাজী সাহেবের কাছে প্রশ্ন থেকে যায়, উনি কি শুধু আকারেই বিশ্বাস করেছেন, নাকি আকারের পরিবর্তনের বিশ্বাসও করেন হিন্দুদের মতো?

মোটকথা, আক্ষরিক উক্ত হাদীস থেকে অধিকাংশ আলিম সুরত বা আকার উদ্দেশ্য নেননি। আর তারা কেউ আল্লাহর রাসূল ﷺ কে অস্বীকারকারী ছিলেন না। এটা কাজী সাহেবের সুস্পষ্ট অপবাদ।

আমরা পরবর্তীতে আলাদাভাবে এই হাদীসের বিষয়ে মুহাদ্দিসগণের ব্যাখ্যা তাদের মূল কিতাব থেকে উল্লেখ করব ইনশা আল্লাহ।

৪। অন্যান্য সিফাত দিয়ে সুরত প্রমাণ করার গোমরাহী

মুফতী কাজী ইব্রাহীম সাহেবের আরেকটি বড় ভ্রান্তি হল, কুরআনে আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত বিভিন্ন সিফাত বা গুণকে আকারের প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এভাবে সিফাত থেকে আকার সাব্যস্ত করা খোদ সালাফের মতেই বড় ধরণের বিভ্রান্তি। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ: বিষয়টি শক্ত প্রতিবাদ করেছেন। এধরণের কাজ মূলত: ব্যক্তির দেহবাদী হওয়ার প্রমাণ। কারণ, সালাফ এগুলোকে সিফাত বলার ক্ষেত্রে সেটিকে ধরণ ছাড়া বলেছেন। তো ধরণছাড়া এসব সিফাতকে এক জায়গায় করে একটা আকার – আকৃতি দেয়া দেহবাদ ছাড়া আর কী হতে পারে? মায়াজাল্লাহ।

“৫। *যারা বলে আকার নেই তারা নাস্তিক*”

জবাব:

খুবই জঘন্য পর্যায়ের তাকফীর এটি। আহলে সুন্নতের লক্ষ-কোটি আলিম আল্লাহ থেকে আকার-আকৃতি মুক্ত বিশ্বাস করেন। এদের সবাইকে নাস্তিক বলা কতো বড় ধৃষ্টতা, তা ভাষায় প্রকাশের মতো নয়। এর চেয়ে বড় ধরণের ধৃষ্টতা আর হতে পারে না। নাউজুবিল্লাহ। **<u>মুফতী সাহেবের এধরণের কাজ থেকে তওবা করা উচিৎ। আহলে সুন্নতের মতামত না জেনে এভাবে অসংখ্য মুহাদ্দিস, ফকীহ ও ইমামকে নাস্তিক বানিয়ে দেয়া সীমাহীন অপরাধ। আল্লাহ তায়ালা কাজী সাহেবকে এধরণের তাকফীরি মনোভাব থেকে হিদায়াত দান করুন।</u>**

আল্লাহর সিফাত অনুবাদ করা যাবে কি না?

উত্তর: এ বিষয়ে আহলে সুন্নতের আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে। **ইমাম আবু হানিফা রহ: এর মতে যেসকল সিফাত বা গুণ সরাসরি সাদৃশ্য বোঝায় বা দেহের অংশ বা অঙ্গ বোঝায়, সেগুলোর অনুবাদ করা নাজায়েজ।** ইমাম গাযযালি রহ:ও একই ধরণের মতামত দিয়েছেন।

এখানে মূল বিষয় আসলে শাব্দিক অনুবাদ নয়। বরং শব্দের কী উদ্দেশ্য নেয়া হচ্ছে এবং সেই উদ্দেশ্যকে আকিদা হিসেবে বিশ্বাস করা হচ্ছে কি না, এটি হল মূল। এজন্য কুরআন-সুন্নাহের এমন অনেক শব্দের শাব্দিক অনুবাদ বৈধ হলেও এর উদ্দেশ্যকে আকিদা বানানো কুফুরী।
যেমন,

পবিত্র কুরআনে এসেছে,

نسو الله فنسيهم

অর্থ: তারা আল্লাহ তায়ালাকে ভুলে গেছে, আল্লাহ তায়ালাও তাদেরকে ভুলে গেছেন।

এখানে শাব্দিক অনুবাদে আমরা লিখছি, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ভুলে গেছেন। কিন্তু এই শাব্দিক অনুবাদের উদ্দেশ্যকে কেউ যদি বাস্তবেই আকিদা হিসেবে বিশ্বাস করা শুরু করে তখন এটি কুফুরী হিসেবে গণ্য হবে। কারণ কেউ যদি বাস্তবেই বলে যে, আল্লাহ তায়ালা ভুলে যান, তাহলে এটি স্পষ্ট কুফুরী।

বোখারী শরীফের হাদীসে রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা বান্দার হাত হয়ে যান, চোখ হয়ে যান, পা হয়ে যান। আমরা শাব্দিকভাবে এই হাদীসের অনুবাদ করলে উদ্দেশ্যের দিক থেকে আক্ষরিক অর্থ নিয়ে এটা আকিদা হিসেবে কখনও বিশ্বাস করি না যে, বাস্তবেই আল্লাহ তায়ালা বান্দার হাত-পা হোন। নাউজুবিল্লাহ।

মোটকথা আকিদার ক্ষেত্রে শব্দ বা বাক্যের উদ্দেশ্য মূল। শাব্দিক অনুবাদটি মূল নয়। তবে সাধারণ মানুষ অনেক সময় শাব্দিক অনুবাদকেই মূল বানিয়ে এগুলো বিশ্বাস করা শুরু করে, এজন্য অনেক আলিম এটি নিষেধ করেছেন।

ইমাম বাযদাবী রহ: তার তার **'উসুলুদ্দীন'** কিতাবে লিখেছেন,

وهل يجوز اطلاق هذه الصفات بلسان سوي لسان العرب؟
بعض اهل السنة و الجماعة قالو: يجوز ذلك ولكن بشرط ان لا يعتقد انه جارحة , **و بعضهم احتاطوا، و قالوا: لا يجوز و هو الصحيح**

অর্থ: 'ইয়াদ', 'আইন' ইত্যাদি সিফাতকে আরবী ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা কি বৈধ?
আহলে সুন্নতের কিছু কিছু আলিম বলেন, এটি বৈধ। তবে শর্ত হল, এগুলো থেকে কখনও অঙ্গ বা অংশের অর্থ বিশ্বাস করবে না। **আহলে সুন্নতের কেউ কেউ সতর্কতা অবলম্বন করে বলেছেন, এটি বৈধ নয়। আর এটিই বিশুদ্ধ মত।**
[উসুলুদ্দীন, আবুল ইসুর বাজদাবী রহ:, পৃ: ৩৯]

ইমাম বাযদাবী রহ: অন্য ভাষায় এজাতীয় সিফাত সাব্যস্ত করাকে নাজায়েজ বলেছেন। এবং এই মতকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন।

তবে দ্বীনি দাওয়াতের প্রয়োজনে যেহেতু কুরআন-সুন্নাহকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করা একটি জ্বরুরি বিষয়, এজন্য এই জ্বরুরতের কথা বিবেচনা করে অনেক আলিম সিফাতের শাব্দিক অনুবাদের অনুমতি দিয়েছেন। তবে সকল ক্ষেত্রে সরল অনুবাদকে আকিদা বানাবার অনুমতি নেই। কেননা অনেক বিষয়ে সরাসরি সরল অর্থে বিশ্বাস করলে সেটি কুফুরী হয়। ভাষার অলঙ্কারের কারণে এজাতীয় ভাষাগত ব্যবহার সঠিক হলেও এর আক্ষরিক অর্থ নিয়ে সেটিকে আকিদা বানাবার বিষয়টি এখানে মুখ্য। বোখারী শরীফের হাদীসে রয়েছে, *আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, আমি অসুস্থ হয়েছি। তুমি আমার সেবা করোনি? আমি ক্ষুধার্ত হয়েছি, তুমি আমাকে আহার করাওনি?*

এজাতীয় বাক্যের ব্যবহার মূলত: রূপক। এগুলোর ভাষাগত ব্যবহার সঠিক। তবে আকিদা হিসেবে আক্ষরিক অর্থ উদ্দেশ্য নেয়া কুফুরী। কখনও এ বিশ্বাস করা যাবে না যে, আল্লাহ তায়ালা অসুস্থ হোন বা আল্লাহ তায়ালা ক্ষুধার্ত হোন।

মোটকথা আরবী ভাষায় হোক বা অন্য যে কোন ভাষায়, আকিদার ক্ষেত্রে বাক্যের উদ্দেশ্য মূল। শব্দের ব্যবহার, শাব্দিক অনুবাদ এগুলো মূল নয়। বর্তমানে সালাফী ভাইদের সবচেয়ে বড় বিভ্রান্তি হল, তারা বাক্যের উদ্দেশ্য বাদ দিয়ে শুধু শব্দ থেকে আকিদা প্রমাণ করতে চায়। যে কোন শব্দ আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত হলেই তারা এটিকে আকিদা বানিয়ে নেয়। অথচ বাক্যের আনুষঙ্গিক বক্তব্য অনুযায়ী একই শব্দের হাজার রকম ব্যবহার থাকতে পারে। এজন্য বাক্যের মর্ম না দেখে শুধু শব্দ ব্যবহার দেখেই আকিদা সাব্যস্ত করা তাদের মারাত্মক একটি ভুল।

যেমন, বোখারী শরীফের হাদীসে রয়েছে,

قلوب إبن آدم بين إصبعين من اصابع الرحمن

অর্থ: আদম সন্তানের অন্তরসমূহ আল্লাহর দুই আঙ্গুলের মধ্যে।
এখানে আল্লাহর দিকে আঙ্গুল সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এখন সালাফীরা এখান থেকে আকিদা বানিয়েছে আল্লাহর আঙ্গুল আছে। অথচ এখানে একটি বড় প্রশ্ন থেকে যায়। শুধু শব্দ থেকে যদি আকিদা প্রমাণ করা যায়, তাহলে পুরো বাক্যের সরল অর্থ থেকে

আকিদা প্রমাণ করা হবে না কেন? একথা কেন বলা হবে না, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আল্লাহর দু'টি আঙ্গুল রয়েছে? কারণ পুরো বাক্যের সরল অর্থ থেকে এটি খুবই স্পষ্ট।

একইভাবে বাইয়াতে রিদওয়ান ঘটনা আমরা সকলেই জানি। সকলেই রাসূল ﷺ এর হাতে হাত রেখে বাইয়াত হলেন। আল্লাহ তায়ালা ওহী পাঠালেন, সাহাবায়ে কেরামের হাতের উপর 'আল্লাহর হাত'। এখানে 'ইয়াদ' শব্দটি আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করার কারণে এটাকে আল্লাহর হাত থাকার প্রমাণ বানিয়েছে। শুধু শব্দের সরল ব্যবহার থেকে যদি এভাবে আকিদা সাব্যস্ত করা যায়, তাহলে পুরো বাক্য থেকে কেন আকিদা প্রমাণ করা হবে না? একথা কেন বলা হবে না যে, বাইয়াতে রিদওয়ানের সময় বাস্তবেই আল্লাহর হাত সাহাবায়ে কেরামের হাতের উপর ছিলো? (নাউজুবিল্লাহ)।

এখানে আরও বড় সমস্যা হল, **শব্দকে যদি আক্ষরিক ধরা হয়, তাহলে বাক্যের অর্থও আক্ষরিক নিতে হয়। এভাবে শব্দ ও বাক্য উভয়টিই যদি আক্ষরিক হয়, তাহলে বক্তার মূল উদ্দেশ্য বিকৃত হয়। এখানে এই আয়াত থেকে যদি আক্ষরিকভাবে আল্লাহর হাত সাব্যস্ত করা হয়, আবার সেই হাত বাস্তবেই সাহাবায়ে কেরামের হাতের উপর ছিল, এটা ধরে নেয়া হয়, তাহলে মূল উদ্দেশ্য বিকৃত হয়। কারণ, আয়াতের আনুষঙ্গিক বক্তব্য থেকে খুবই স্পষ্ট যে, এখানে আক্ষরিক বা সরল অর্থ উদ্দেশ্য।** তাদের হাতের উপর বাস্তবেই আল্লাহর হাত আছে, এমনটি আদৌ উদ্দেশ্য নয়। ***বরং আয়াতের মূল উদ্দেশ্য আল্লাহর সাহায্য ও রহমত তাদের এই বায়াতের সাথে। আল্লাহ তায়ালা তাদের এই বায়াতে সন্তুষ্ট।***

এখন আক্ষরিক ব্যবহার থেকে আকিদা প্রমাণ করতে গিয়ে আমরা আয়াতের আসল উদ্দেশ্যকে বিকৃত করে ফেলছি। এটাও এক ধরণের তাহরীফ বা বিকৃতি। কারণ,**বিকৃতি দু'ধরণের হয়।**

➤বক্তা সরল বা বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নিলে সেটাকে প্রমাণ ছাড়া রুপক অর্থে নেয়া।

➤বক্তা রুপক অর্থ উদ্দেশ্য নিলে সেটাকে জোর করে আক্ষরিক অর্থে রাখা।

উভয় ক্ষেত্রেই বক্তার উদ্দেশ্য ও বক্তব্যকে বিকৃত করা হয়। আমাদের সালাফী ভাইয়েরা প্রথম বিকৃতি থেকে বাঁচতে গিয়ে কুরআন-সুন্নাহের অসংখ্য জায়গায় দ্বিতীয় বিকৃতি করেছেন। যেখানে সুস্পষ্টভাবে সরল অর্থ উদ্দেশ্য নয়, সেখানেও তারা সরল অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছে তাদের আকিদা প্রমাণের জন্য। আর এর মাধ্যমে পুরো বক্তব্য বিকৃত হয়েছে।

পবিত্র কুরআন থেকে আমরা আরেকটি উদাহরণ দেখি। কুরআনে এসেছে,

انما نطعمكم لوجه الله

অর্থ: নিশ্চয় আমরা তোমাদেরকে আল্লাহর চেহারার জন্য আহার করাই।

এখানে ‘চেহারা’ শব্দটি আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত হয়েছে। আর আল্লাহর দিকে কোন কিছু সম্পৃক্ত হলেই সালাফীরা সেটিকে বাহ্যিক অর্থে নিয়ে আকিদা বানিয়ে ফেলে। অথচ এই আয়াতে ‘চেহারা’ কে বাহ্যিক অর্থে নিলে পুরো বাক্যের অর্থ বিকৃত হয়েছে। কারণ, এখানে আরবীর সাধারণ ব্যবহার অনুযায়ী **‘আল্লাহর চেহারা’ দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য।** এখন চেহারাকে বাহ্যিক অর্থে ধরলে বাক্যেরও অর্থও বাহ্যিক ধরতে হবে। সেক্ষেত্রে আল্লাহর চেহারার জন্য তোমাদের আহার করাই, এই কথার সরল অর্থ কী? একথার উদ্দেশ্য কী? ‘চেহারা’ শব্দটিকে আক্ষরিক অর্থে নিয়ে সেটাকে আকিদা বানাতে গিয়ে আমরা এখানে বক্তার মূল উদ্দেশ্যকেই বিকৃত করে ফেলছি।

এখানে শব্দকে আক্ষরিক রাখতে গিয়ে বাক্যের অর্থকে বিকৃত করা হচ্ছে। অথচ হওয়ার দরকার ছিল উল্টো। কারণ, বক্তার মূল উদ্দেশ্য পুরো বাক্যে সুস্পষ্ট হয়। শুধু শব্দ দিয়ে পুরো বাক্যের অর্থ ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা যায় না।

এখানে সালাফী ভাইদের বিকৃতি হল,

১। শব্দকে আক্ষরিক রাখতে গিয়ে বাক্যের উদ্দেশ্য বিকৃতি।

২। শুধু শব্দকে আকিদা বানালেও বিকৃত বাক্যের উদ্দেশ্যকে আকিদা বানায় না। অথচ আকিদা নির্ধারণ করলে শব্দ ও বাক্য পুরোটায় আকিদা হওয়ার কথা।

৩। কুরআন–সুন্নাহের সুস্পষ্ট রুপক ব্যবহারকেও তারা আক্ষরিক অর্থে রেখে সেগুলোকে আকিদা বানায়। এবং কুরআন-হাদীসে রুপকের ব্যবহারকেই অস্বীকার করে।

৪। বাক্যের বাহ্যিক অর্থকে আকিদা বানাবার ক্ষেত্রে তারা ইসলামী আকিদার অন্যান্য মূলনীতি লঙ্ঘন করে। **এক্ষেত্রে ‘ধরণ অজানা’(বালকাফা/বিলা কাইফ) শব্দ ব্যবহার করে স্পষ্ট কুফুরী বিষয়কেও আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করে বাহ্যিক অর্থ বিশ্বাসের নামে।**

আহলে সুন্নতের সাথে সালাফীদের মৌলিক পার্থক্য হল,

১। বক্তার উদ্দেশ্য নির্ধারণে তারা পুরো বাক্য ও আনুষঙ্গিক বক্তব্য সামনে রাখে।

২। বক্তার মূল উদ্দেশ্য তথা পুরো বাক্যের উদ্দেশ্য ঠিক রাখার প্রয়োজনে শব্দের অর্থকে তারা রুপক হিসেবেও স্বীকৃতি দেয়। অর্থাৎ তাদের কাছে পুরো বাক্যের অর্থ ও উদ্দেশ্য মূল। পুরো বাক্যের অর্থ ও উদ্দেশ্য না দেখে শুধু শব্দ আকিদা নির্ধারণে মানদন্ড হতে পারে না।

৩। পুরো বাক্যের উদ্দেশ্য নির্ধারণের পর সেটি যদি বাহ্যিক অর্থে থাকে, তাহলে তাকে বাহ্যিক অর্থে বিশ্বাস করা। আর যদি রুপক অর্থ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে রুপক উদ্দশ্যে বিশ্বাস করা। তারা সব কিছুকেই রুপক বলেন বা সব কিছুকেই বাহ্যিক বলেন না। বরং আরবী বালাগাত (অলঙ্কার শাস্ত্র) এর নিয়ম মেনে বাহ্যিক ও রুপক অর্থের পার্থক্য করে থাকে।

৪। বক্তার মূল উদ্দেশ্য নির্ধারণের পর সেটি ইসলামী আকিদা হবে কি না, এক্ষেত্রেও কিছু মূলনীতি লক্ষ রাখা হয়। মৌলিকভাবে এটি যেন অন্যান্য অকাট্য আকিদার বিরোধী না হয়। অর্থাৎ ইসলামি আকিদা যেন স্ববিরোধী না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখা হয়।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, ***আকিদার আলোচনায় আসলে শাব্দিক অনুবাদ একটি গৌণ বিষয়।*** কারণ, মূল বিতর্ক উদ্দেশ্য নির্ধারণকে কেন্দ্র করে। কারও যদি উদ্দেশ্য বাতিল হয়, তাহলে অনুবাদ না করে সরাসরি আরবীতে বললেও তাদের বক্তব্য বাতিল। **এজন্য আমরা আরব-সালাফীদের আকিদাকে ভ্রান্ত বলি। যদিও তারা মূল আরবীতেই তাদের আকিদা রাখে।** পক্ষান্তরে উদ্দেশ্য যদি সঠিক হয়, তাহলে আরবী ভাষী না হয়েও একজনের আকিদা বিশুদ্ধ হতে পারে।

সালাফীরা সাধারণ মানুষকে বোঝাতে চায়, তাদের সাথে আহলে সুন্নতের মূল বিতর্ক শব্দ ও অনুবাদ নিয়ে। অথচ এটি সম্পূর্ণ অবাস্তব কথা। তাদের সাথে আমাদের **মূল বিতর্ক উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও আকিদা নির্ধারণে।** তারা সাধারণ মানুষকে শব্দের ব্যবহার দেখিয়ে ধোঁকা দেয় যে, এই যে দেখো আল্লাহর দিকে হাতকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তার মানে আল্লাহর হাত আছে। অথচ এটি সম্পূর্ণ দলিলহীন একটি দাবী। শুধু শব্দ সম্পৃক্ত করলেই উদ্দেশ্য ও আকিদা নির্ধারিত হয় না। পুরো বাক্য ও আনুষঙ্গিক বক্তব্য থেকে মূল উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়। কুরআনে যখন বলা হল, দিনের চেহারা (ওয়াজহান নাহার), তারা এখানে কিন্তু শুধু শব্দ দেখিয়ে আকিদা শেখাতে আসে না। *তারা বলে না যে, কুরআনে যেহেতু দিনের চেহারার কথা আছে, এজন্য আমরা বিশ্বাস করি দিনের চেহারা আছে। কিন্তু এর ধরণ আমরা জানি না।* কুরআনে যখন বলা হল, সত্যের পা (কাদামা সিদক), তারা কিন্তু আমাদেরকে আকিদা শিখায়নি যে, কুরআনে যেহেতু সত্যের পা বলা হয়েছে, আমরা বলব, সত্যের পা আছে। কিন্তু ধরণ জানি না। এটাই সহীহ আকিদা। এসব ক্ষেত্রে যদি না বলে, তাহলে আল্লাহর দিকে হাত, পা ইত্যাদি সম্পৃক্ত করলেই বাক্যের উদ্দেশ্যকে বিকৃত করে হলেও তারা আকিদা প্রমাণে লড়াই শুরু করে কেন?

এজন্য অনুবাদ হোক বা না হোক, এটি আকিদার ক্ষেত্রে মূল বিতর্ক নয়। বক্তব্যের উদ্দেশ্য মূল। এবং সেই উদ্দেশ্যকে আকিদা বানানো হবে কি না, এটি মূল বিতর্ক।

অনুবাদের প্রশ্নে মূল কথা হল, আকিদা সঠিক থাকলে শুধু শাব্দিক অনুবাদ করা যেতে পারে। এটি বড় কোন বিষয় নয়। আর আকিদা ভুল হলে অনুবাদ করা হোক বা না হোক, বক্তার উদ্দেশ্য ও মর্ম বিকৃত করার কারণে এদের অক্ষরবাদিতা বা বাহ্যিকবাদিতা নিষিদ্ধ।

সিফাত সংক্রান্ত যেসব আয়াতের মর্ম নিয়ে আকিদাকেন্দ্রিক বিরোধ, এগুলো সম্পর্কে আহলে সুন্নতের স্বীকৃত পন্থা তিনটি:

১। বাহ্যিক বা সাদৃশ্যপূর্ণ অর্থ ও উদ্দেশ্য নাকচ করে মূল শব্দটিকে সিফাত বলা। বাহ্যিক অর্থ ও উদ্দেশ্য বাদ দেয়ার সাথে সাথে 'কাইফ' বা ধরণকেও নাকচ করা।

একে পরিভাষায় **ইসবাত মায়াত তানজীহ** বলে।

২। বাহ্যিক বা সাদৃশ্যপূর্ণ অর্থটি বাদ দেয়ার পর বিষয়টিকে আল্লাহর উপর ন্যস্ত করা। আমরা কুরআন-সুন্নাহের উপর ঈমান এনেছি। বিরোধের বিষয়গুলোর আসল উদ্দেশ্য ও মর্ম আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।

একে পরিভাষায় **তাফয়ীদ মায়াত তানজীহ** বলে।

৩। বাহ্যিক বা সাদৃশ্যপূর্ণ অর্থটি বাদ দেয়ার পর আনুষঙ্গিক বক্তব্য ও আরবী ভাষার নিয়ম থেকে বক্তার উদ্দেশ্য বুঝে একটি মর্ম নির্ধারণ করা।

এটি **তা'বীল মায়াত তানজীহ** বলে।

সিফাত সংক্রান্ত পুরো বিতর্কটাই সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী যুগের। সাহাবায়ে কেরামের যুগে এ বিষয়ে কোন বিতর্কের সূচনা হয়নি। এজন্য এ বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের সুস্পষ্ট কোন বক্তব্য নেই। বিশেষ করে, 'ইয়াদ'(হাত), 'কাদাম'(পা) ইত্যাদিকে কোন সাহাবী কোন বক্তব্যকে আলাদাভাবে সিফাত বলেছেন, এটি পাওয়া যায় না। এগুলোর সুস্পষ্ট তাফয়ীজও কোন সাহাবি থেকে পাওয়া যায় না। তবে কিছু কিছু বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের তা'বীল পাওয়া যায়।

এখানে মৌলিকভাবে কয়েকটি বিষয় সরাসরি সাহাবায়ে কেরামের দিকে নিসবত করা ভুল,

১। সাহাবায়ে কেরামের এগুলোর বাহ্যিক অর্থে বিশ্বাস করতেন। ইবনে তাইমিয়া সব-সময় এ দাবী করেছেন। কিন্তু দাবীটি সঠিক নয়।

২। সুস্পষ্ট শব্দে তাদের থেকে 'সিফাত' বলা বা তাফয়ীজও পাওয়া যায় না। সুতরাং এগুলো সরাসরি সাহাবায়ে কেরামের দিকে নিসবত করা ভুল। যদি কেউ পায়, তাহলে ভিন্ন কথা।

৩। সাহাবায়ে কেরাম থেকে কিছু কিছু তা’বীল মুফাসসিরগণ এনেছেন, এগুলো যদি সনদসহ তাদের থেকে সাবিত হয়, তাহলে এগুলো সঠিক।

উপরোক্ত আলোচনা গুলো হতে বুঝা গেলো সালাফিবাদের নাম দিয়ে বিকৃত আক্বিদা ধারণকারীরা আসলে সালফে সালেহিনের অনুসারি নয়।এদেরকে খাটি মনে তাওবা করে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জাম'আহর আকিদা ধারণ করতে হবে।কেননা রাসুল ﷺবলেছেন,কেবল এবং কেবল মাত্র নাজাতপ্রাপ্ত দল হল আহলে সুন্নত ওয়াল জাম’আত।